মহান চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

মহান চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

AHEAD Initiatives

মহান চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা
(Mahan Chintabidder Bhabnai Sikhha)

প্রকাশকঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস
৫/১/২ জি, কর্ণফিল্ড রোড
কলকাতা ৭০০০১৯

ফোন- ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯
ইমেল- ahead@aheadinitiatives.in

প্রচ্ছদঃ অদ্রীশ

প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ২০১৫

নির্মাণব্যয় বাবদ প্রার্থিত অনুদানঃ একশত টাকা

মুদ্রণঃ ডি. আর. সি. এস. সি, কলকাতা

ভূমিকা

"শিক্ষা" বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি স্কুলের শিক্ষা, কিন্তু শিক্ষার অর্থ যে আরও ব্যাপক, আরও গভীরে তার শেকড়, সেই উপলব্ধির জগতকে বুঝতে, ভাবতে শিখিয়েছেন কিছু মহান শিক্ষাচিন্তাবিদ। জীবনের প্রয়োজন সাধনের মধ্যেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে সেটা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা ভুলতে বসেছি। তাই এই পুস্তকে আমরা চেষ্টা করেছি রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা UNESCO প্রকাশিত একগুচ্ছ মহান শিক্ষাচিন্তাবিদদের ভাবনাগুলি তুলে ধরতে, যা তাঁরা ব্যক্ত করেছিলেন তাঁদের কাজ এবং লিখনের মধ্য দিয়ে।

তাই যাঁরা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, ভাবছেন, নতুন পথের দিশা খুঁজছেন শিক্ষাকে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবা যায় কিনা, তাঁদের এবং বিদ্যালয়ের অগণিত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছে এই লেখাগুলি এক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। আমরা আশা করবো তাঁদের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে নতুন পাঠকবৃন্দ, যাঁরা অনুপ্রাণিত হবেন এই সব মহান মনীষার দ্বারা এবং তাঁদের চেতনায় শাণিত স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে তাঁরাও হয়ে উঠবেন নতুন শিক্ষার বার্তাবাহী।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস

সুচীপত্র

১। প্লেটো ৭
২। অ্যারিসটটল ১২
৩। কনফুসিয়াস ১৫
৪। আল ফারাবি ১৯
৫। আল গাজালি ২৩
৬। জাঁ জাক রুশো ২৬
৭। ইমানুয়েল কান্ট ৩০
৮। জর্জ হেগেল ৩৩
৯। ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবেল ৩৫
১০। নিকোলাই ফ্রিদরিক সেভেরিন গ্রুনউইগ ৩৯
১১। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ৪৩
১২। লিও তলস্তয় ৪৬
১৩। জন ডিউই ৪৯
১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৩
১৫। স্বামী বিবেকানন্দ ৫৬
১৬। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ৫৯
১৭। মারিয়া মন্টেসরি ৬৩
১৮। শ্রী অরবিন্দ ৬৬
১৯। আন্টোনিও গ্রামসি ৬৯
২০। মাও জে দঙ ৭৩
২১। জে. কৃষ্ণমূর্তি ৭৭
২২। জে.পি.নাইক ৮১
২৩। ম্যালকম আদিসেশিইয়া ৮৪
২৪। পাওলো ফ্রেইরী ৮৭
২৫। জুলিয়াস কামবারাগে ন্যেরেরে ৯০
২৬। ইভান ইলিচ ৯৩

(৪২৮ – ৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

প্লেটো

চার্লস হুমমেল (Charles Hummel) –এর লেখা ইংরাজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এথেন্সবাসীগণ [....], আপনাদের চাইতে আমি বরং ঈশ্বরকে মেনে চলব। যতক্ষণ আমার এ দেহে প্রাণ থাকবে, দর্শন চর্চ্চা ও সত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আমি বন্ধ করব না। যার সঙ্গে আমার দেখা হবে তাকেই আমি এ বিষয়ে পরামর্শ দেবো। আমি তাকে বলব, "হে বন্ধু আমার, তুমি সেই এথেন্সের নাগরিক, যে নগর জ্ঞান ও শৌর্যের জন্য বিখ্যাত। কেবলমাত্র ধন উপার্জন করা আর খ্যাতি ও যশ অর্জনের জন্য তুমি এতো যত্নশীল, তাতে কি তুমি লজ্জিত নও? তুমি কি সত্যকে জানতে, বুঝতে সচেষ্ট হবে না, আত্মার উৎকর্ষের জন্য একটিবারও চিন্তা করবে না?" এথেন্সের বিচারসভায় সক্রেটিস এমনই এক জবাবদিহি করেছেন। নাগরিক ভোট তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে। তরুণদের বিপথে চালিত করার দোষে তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন।

আর এ সমস্ত কিছু আমরা জানছি তাঁর শিষ্য প্লেটোর লেখা থেকে। ৩৯৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ, সক্রেটিসকে কারাগারে হত্যা করা হয়েছিল। প্লেটোর তখন ২৭-২৮ বছর বয়স। চোখের সামনে প্লেটো দেখতে পেলেন কিভাবে তাঁর অত্যন্তপ্রিয় জন্মভূমি এক নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঢলে পড়ছে। সক্রেটিস নিধনে এথেনীয় গণতন্ত্রের ভূমিকা তাঁকে অসম্ভব আঘাত হানল।

কে এই প্লেটো বা সক্রেটিস ?

খ্রিষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে পঞ্চম শতক এই সময় পর্বটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অসাধারণ সময়ের পটভূমি। প্লেটো জন্মগ্রহণ করছেন ঠিক এই সময় ৪২৮ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। তাঁর ঠিক আগে এই পৃথিবীর মাটিতে এসেছিলেন যুগান্তকারী সব ব্যক্তিত্ব, যেমন – কনফুসিয়াস(ছয় শতক), বুদ্ধ (৫৫০ – ৪৮০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ), সক্রেটিস (৪৬৯ – ৩৯৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ)। পাঁচের শতকের গোড়ার দিকে উপনিষদ লেখা হচ্ছে। গ্রীসের প্রখ্যাত এথেন্স নগরী। শৌর্যে, বীর্যে, জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে পরাক্রমী এথেন্স। পারিবারিক সূত্রে এথেন্স নগর- রাষ্ট্রের রাজনীতিক মহলের সঙ্গে প্লেটোর সম্পর্ক থাকলেও তাতে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও ক্ষমতার অলিন্দ ধরে প্লেটো হাঁটলেন না। তিনি বেছে নিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। তার কারণ তিনি শিক্ষক সক্রেটিসের সংস্পর্শে এসেছিলেন। যদিও সক্রেটিস নিজেকে শিক্ষক বলতেন না।, দার্শনিকও মনে করতেন না। অথচ

তখনকার এথেন্সের পথে ঘাটে সক্রেটিসকে ঘিরে থাকত একগুচ্ছ উজ্জ্বল শিক্ষিত তরুণ। কে এই সক্রেটিস জানতে গেলে পড়তে হবে প্লেটোর লেখা ডায়ালগগুলি। কেন সক্রেটিসকে মারা হলো তাও জানতে গেলে পড়তে হবে প্লেটোর লেখা "এপোলজি" ডায়ালগটি। ৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সক্রেটিসকে কারাগারে হত্যা করা হলো। সক্রেটিসের হত্যা প্লেটোর মনে ভয়ঙ্কর আঘাত হানল এবং সেই আঘাত এতটাই বেশি ছিল যে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে প্লেটো দেশান্তরী হলেন দীর্ঘ বারো বছরের জন্য। এথেন্সের সমৃদ্ধি, জ্ঞানচর্চ্চা, সংস্কৃতি ছাপিয়ে প্লেটোর সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল এথেনীয় গণতন্ত্রের অবক্ষয়। প্লেটো চলে গেলেন গ্রীসের অন্য এক নগর রাষ্ট্রে। দেখা করলেন, কথা বললেন, জানলেন, শিখলেন ওখানকার প্রখ্যাত দার্শনিক ইউক্লিডের সঙ্গে। গেলেন ইজিপ্টে, কাইরেনে (অধুনা লিবিয়া), দেখা করলেন পিথাগোরিয়েন সদস্যদের সঙ্গে। দক্ষিণ ইতালি আর মাগনা গ্রাসিয়া শহরে। এই দেশ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর বই লেখা। গুটিকয় বাদে প্লেটোর লেখা অধিকাংশ ডায়ালগ কথোপকথনের প্রধান বক্তা সেই সক্রেটিস। ডায়ালগগুলির বিষয় বৈচিত্র্যও অভিনব। ডায়ালগগুলিতে নানান চরিত্র সক্রেটিসের সঙ্গে সেইসব বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন সক্রেটিস-পদ্ধতিতে। এইভাবেঃ কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শৌর্য- সাহস, সদগুণ, ন্যায়বিচার, প্রেম, সৌন্দর্য, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, ভাষাচর্চ্চায় অলঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। কেমন ছিল এই সক্রেটিস – পদ্ধতি যাকে অনুসরণ করে প্লেটো তাঁর ডায়ালগগুলি লিখেছিলেন?

প্রবীণ সক্রেটিস ঘুরে বেড়াতেন এথেন্স নগরীর পথে ঘাটে, হাটে – বাজারে, ভোজবাড়িতে। কথা বলতেন মানুষের সঙ্গে – জ্ঞানীগুণী কিংবা সাধারণ মানুষ। যে কোন একটি বিষয় বেছে নিতেন আলোচনার জন্য। আর কথোপকথন শুরু করার আগেই স্বীকার করে নিতেন যে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কিছুঈ জানেন না। জানার আগ্রহে এই আলোচনা করছেন। এরপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রেটিস তাঁর কথোপকথন চালাতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ত যে সক্রেটিসের প্রশ্নবাণে উত্তকারীরা ধরাশায়ী হয়ে পড়েছেন। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে উত্তরকারীরা তেমন কিছুই জানেন না– তাঁদের জ্ঞানের অসারতা প্রকটিত হতো। কেন এমন করতেন সক্রেটিস? তার কারণ সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন মনের ভিতর থেকে ভ্রান্ত ধারণা– অলীক জ্ঞানের জাল ভেদ করতে পারাটাই হলো ভালো জীবন বা উত্তম জীবন যাপন করতে শেখার প্রথম ধাপ। উত্তম জীবনের অর্থ ব্যক্তিগত জীবন ও যৌথ জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ব্যক্তির নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে মেলবন্ধন।

প্লেটো তাঁর লেখা ডায়ালগগুলিতে সক্রেটিসের চরিত্রকে দিয়ে যেমন সক্রেটিসের দর্শন- ভাবনার কথা বলিয়েছেন তেমনি নিজের চিন্তা -ভাবনাও প্রকাশ করেছেন। সক্রেটিসের মতো প্লেটোর দর্শনের কেন্দ্রে ছিল মানুষ। বিশেষ করে মানুষের নৈতিক সমস্যা। গ্রীক নগর- রাষ্ট্র বা পোলিস বাস করা সাধারণ মানুষের অবস্থান, তাদের

সঠিক আচরণ, ন্যায় বিচার ব্যবস্থা– প্রভৃতি প্লেটোকে ভাবাতো। রাজনীতি বিষয়ক দুটি লেখা– 'দ্য রিপাবলিক' ও 'ল' প্লেটোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজনীতি - রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক বই দুটিতে নীতিশাস্ত্র বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। তাছাড়াও বই দুটিতে শিক্ষা নিয়ে প্লেটোর ভাবনা চিন্তাও ধরা পড়েছে। শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা– তার পরিচালনা, পাঠক্রম নিয়ে প্লেটোর যুগান্তকারী ভাবনা চিন্তা আজও সমাদৃত। বিদ্যার জগতে প্লেটোর দুটি অবদান– এক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান (সাইকোলজি)– এর মতো বিষয়গুলি। 'দ্য রিপাবলিক'– এ প্লেটোর রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনাগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিদ্যাচর্চ্চার জন্ম দিয়েছে।

আর প্লেটোর মতে সাইকোলজি হলো "আত্মার বিজ্ঞান"। কেমন ছিল প্লেটোর জীবন দর্শন? বাস্তব জগৎকে বুঝতে মানুষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয়। আর এই ইন্দ্রিয় নির্ভরতা মানুষকে বাস্তব থেকে দূরে নিয়ে যায়। সুন্দর, সত্য ও কল্যাণময় বা ভালো 'র' মতো পরম অবিনশ্বর ধারণাগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করা মানুষের একটা প্রচেষ্টা মাত্র। তাতে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে। ইন্দ্রিয়, কামনা, আকাঙ্খার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে 'চির সত্য, সুন্দর ও ভালো' র অন্বেষণে মানুষকে পথ দেখানোই ছিল প্লেটোর দর্শন। আর সেটা সম্ভব শিক্ষা ও দর্শন চর্চ্চার হাত ধরে। তাই প্লেটো উপস্থাপনা করলেন এক আদর্শ নগর–রাষ্ট্র বা পোলিস– এর। শিক্ষাই এই রাষ্ট্রকে তৈরি করে। এই রাষ্ট্রের নাগরিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এক গোষ্ঠী। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। তার কারণ নাগরিকরা সেই মতো উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত। এই রাষ্ট্র টিঁকে থাকে, বেঁচে থাকে শিক্ষার অস্ত্রে। শিক্ষাই এই রাষ্ট্রকে যে কোন ধরণের ক্ষতি সাধক প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এই রাষ্ট্রের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ব্যক্তিগত উন্নতি নয়। এই শিক্ষার লক্ষ্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য আনন্দময় জীবন যাপন সুনিশ্চিত করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য রাষ্ট্রের পরিষেবা করা। এই আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা হলো ন্যায়ের প্রতিমূর্তি।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক, কেমন ছিল প্লেটোর প্রবর্তিত শিক্ষানীতি – শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠক্রম। কোন পরিপ্রেক্ষিতেই বা এমনটা তিনি ভেবেছিলেন? প্লেটোর জীবৎকাল ৪২৮-৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। তাঁর জীবদ্দশাতেই গ্রীসে ঘটেছিল যুগ-রূপান্তর। প্রাচীন যুগের গোধূলি লগ্নে এসে পৌঁছেছিল গ্রীস। ছোট ছোট স্বাধীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির মৃত্যু ঘটেছিল আর তার জায়গায় মাথা তুলছিল আলেক্সানদ্রিয়ান সাম্রাজ্য। পেলোপনিসীয় যুদ্ধে পরাক্রমী এথেন্স নগর-রাষ্ট্র পরাভূত হয়েছিল। এথেনীয় গণতন্ত্রে দেখা দিয়েছিল অবক্ষয়। প্রিয় এথেন্সের অধঃপতন প্লেটোর মনে পরিবর্ত্তন, নবপ্রবর্তনের প্রতি এক গাঢ় অবিশ্বাস জন্মায়। মনের মধ্যে দানা বাঁধে এক চিরস্থায়ী আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন। তৈরি করেন আদর্শ সমাজ– রাষ্ট্রের জন্য তত্ত্ব ('দ্য রিপাবলিক') ও সেই

তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক ('ল' গ্রন্থে)।

তিনি শিক্ষাকে এই আদর্শ সমাজের রূপকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যথার্থ শিক্ষাই সমাজকে অস্থায়ীত্ব, অবক্ষয় ও কলুষতা থেকে রক্ষা করতে পারে। এই সমাজ-রাষ্ট্রের পরিচালনভার থাকবে এক 'অভিভাবক' শ্রেণীর হাতে। কারা এই অভিভাবক শ্রেণী? এককথায় দার্শনিক – রাজা। অর্থাৎ প্লেটোর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে কয়েক জন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। যাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা তাড়িত নন। "বহুজন হিতায়" হবে যাঁদের জীবনের আদর্শ। অভিভাবক শ্রেণীর আর একটি অঙ্গ হবে রক্ষীবাহিনী। কেমন হবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা যার গুণে তৈরি হবে এমন মানুষ।

১) শিক্ষা ব্যবস্থার মূল তত্ত্বাবধানে থাকবে "সুপারভাইজার"। পরিচালনবর্গের অন্তর্গত নানান উচ্চপদের মধ্যে এই শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারভাইজার পদটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সুপারভাইসারের কাজ হবে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকল শিশুর শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রয়োজন সব দিকগুলির ব্যবস্থা করা। সুপারভাইজারের নিচে থাকবে বেশ কয়েকটি সুপারিনটেনডেন্ট পদ। সুপারিনটেনডেন্টদের অধীনে থাকবে স্কুল ও জিমনাসিয়াম (শরীরচর্চ্চা কেন্দ্র) গুলির পরিচালনা, ব্যবস্থাপনার মতো কাজগুলি। স্কুল ও জিমনাসিয়ামগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি, সার্বিক উন্নতির খেয়াল রাখবেন সুপারিনটেনডেন্টরা। নিয়মিতরূপে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।

২) প্লেটোনিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর মন গঠন করা। তাই শিশু শিক্ষায় শরীরচর্চ্চা ও সঙ্গীতের ভূমিকা অপরিহার্য।

৩) প্রাক- স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও প্লেটো বলে গেছেন, যার দায়িত্বে থাকবে মা-বাবা। ছোটবেলা থেকে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানোর পালা শুরু হবে গল্পের মধ্যে দিয়ে। গল্পের বিষয় নির্বাচন গুরুত্ব পাবে। কারণ ছোটবেলাকার নমনীয় মন যে ছাঁচে ঢালা হবে পরে তা-ই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা শিশু শিক্ষায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বড় হয়ে যে যা হতে চায়, তার চর্চ্চা শৈশব থেকেই শুরু হবে খেলার মাধ্যমে। তিন থেকে ছয় বছরের শিশুদের একত্রে খেলাধূলা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন প্লেটো।

৪) শিশু ছয় বছরে স্কুলে ভর্ত্তি হবে। প্রাথমিক ভাবে শিশু পড়তে, লিখতে ও গুণতে শিখবে। বছর দশেক অব্দি এই শিক্ষা চলবে। ১৩ বছরে শুরু হবে লায়ারে (এক ধরণের বীণা) বাজানোর চর্চ্চা। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চ্চা চলবে, চলবে নানা ধরণের খেলাধূলার অভ্যাস, যেমন অস্ত্রশিক্ষা, ঘোড়ায় চড়া। ১৮ বছর বয়স অব্দি চলবে এই মৌলিক শিক্ষাক্রম। গোটা শিক্ষাক্রমে থাকবে নানান পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা। ছেলে– মেয়েরা, লিঙ্গ নির্বিশেষে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষাক্রমে অংশ নেবে।

৫) ১৮ বছর উত্তীর্ণ হলে সকল পড়ুয়াকে বাধ্যতামূলক শারীরিক প্রশিক্ষণ ও সামরিক

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। দুই থেকে তিন বছর ধরে চলবে এই প্রশিক্ষণ।

৬) ২১ বছর বয়সী পড়ুয়ারা এবার ফলাফল অনুসারে উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়াতে পারবে। আর এই উচ্চশিক্ষার জন্য তাদের ভর্ত্তি হতে হবে প্লেটোর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত " অ্যাকাডেমী"-তে। শিক্ষাচর্চ্চা আর গবেষণা কেন্দ্র হবে এই অ্যাকাডেমী। অ্যাকাডেমীতে পড়তে আসা পড়ুয়ারা শিখবেন– পাটীগণিত, জ্যামিতি, রাজনীতি, দর্শন, জ্যোর্তিবিদ্যা ও হারমনি অর্থাৎ শব্দ বিজ্ঞান। অ্যাকাডেমীর সাংগঠনিক চরিত্র সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা না গেলেও এটা জানা গেছে যে অ্যাকাডেমীর উদ্যানে বসত প্রকৃতি– বিজ্ঞানের ক্লাস। প্রাণী জগতের জীবন প্রক্রিয়া আর গাছ-পালা সবজি ভেষজের বাড়বৃদ্ধি নিয়ে প্রায়োগিক ক্লাস চলত সেখানে। ১০ বছর ধরে অ্যাকাডেমীর পঠন পাঠন চলত। তবে ৬ – ২০ বছর বয়স অব্দি ছিল বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণের সময়সীমা। বাধ্যতামূলক শিক্ষা গৃহীত হবে মুক্ত পরিবেশে, বাধ্যতামূলক নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। শিক্ষকের দায়িত্ব পড়ুয়াকে মিথ্যা জ্ঞান থেকে রক্ষা করে সত্য ও সদগুণের পথে চালিত করা। প্লেটোর কাছে শিক্ষকতা জীবিকা অর্জনের বিষয় নয়।

৭) এমত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এরপর হয় দর্শন চর্চ্চা বেছে নেবে আর নয়তো বা রাষ্ট্রশাসনের লক্ষ্যে উচ্চ-পদে আসীন হবে। দর্শন চর্চ্চায় এসে তারা কথোপকথন– কলা বা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অভ্যাস করবে। এই দর্শন শিক্ষা চলবে পাঁচ বছর। ৩৫ বছর বয়সী ব্যক্তি এবার পনেরো বছরের জন্য সামরিক ও নাগরিক পরিষেবায় যুক্ত হবে। এখানেও চলবে নিরন্তর পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা যার মধ্যে তাদের পারদর্শীতা পরীক্ষিত হবে। এইভাবে কেটে যাবে ১৫টি বছর। ৫০ বছরের প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া এবার অবসর জীবনে উপনীত হবে এবং এই অবসর জীবন প্লেটোনিক ভাবনা অনুসারে হবে এক দার্শনিকের জীবন। জীবনভর চলবে এই শিক্ষা। মজার কথা প্লেটোর এই শিক্ষানীতি– শিক্ষা ব্যবস্থার গোটাটাই রাষ্ট্রের অভিভাবক শ্রেণীর মানুষদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে।

এথেনীয় সমাজে বাস করা দাস ,বণিক ও কারিগর শ্রেণীর সদস্যদের প্লেটো কিন্তু তাঁর শিক্ষানীতিতে স্থান দেননি। বণিক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষেরা বিদেশী ছিলেন ফলে তারা এথেন্সের নাগরিক আইন বর্হিভূত ছিলেন। প্লেটোর শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার আতুড় ঘর ছিল এক আদর্শ রাষ্ট্র। সেই কল্পরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা থাকবে এক আদর্শ 'অভিভাবক' শ্রেণীর হাতে। সেই অভিভাবকদের গড়ে-পিটে নেবে এক অতন্দ্র প্রহরী শিক্ষা ব্যবস্থা। তেমনটাই চেয়েছিলেন প্লেটো।

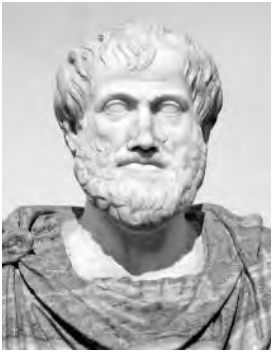

(৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

অ্যারিসটটল

চার্লস হুমমেল (Charles Hummel) –এর লেখা ইংরাজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত অবসর বা অবকাশ। স্কুল শব্দটা এসেছে গ্রীক শব্দ 'স্কোলে' থেকে, যার বাংলা প্রতিশব্দ অবসর বা অবকাশ। পড়াশোনা বা শিক্ষা বলতে আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তার সঙ্গে অবসর– অবকাশকে মিলিয়ে দেওয়া এ যেন ভয়ানক এক ঠাট্টা! অথচ এমনটাই বিশ্বাস করতেন অ্যারিসটটল। প্লেটোর ছাত্র। পড়েছিলেন প্লেটোর তৈরি করা অ্যাকাডেমিতে । একাধারে গবেষক, অধ্যাপক, নৈয়ায়িক এবং পশ্চিমী বিজ্ঞানের জনক অ্যারিসটটল এথেন্সে একটা স্কুল খুলেছেন। লাইসেয়াম। সকালে পড়তে আসত স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা। দুপুরের পর ওটাই হয়ে উঠত একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। অ্যারিসটটল পরাক্রমী আলেকজান্দারের মাষ্টারমশাই ছিলেন। দেশ– বিজয়ী আলেকজান্দারের মনের মধ্যে যে অভিযাত্রী মন আর কৌতুহল লুকিয়ে থাকত, তার বীজ পুঁতেছিলেন অ্যারিসটটল। প্লেটো-সক্রেটিসের কথোপকথন ধাঁচে, নানা বিষয়ে নিজের ভাবনা চিন্তা লিখে গেছিলেন। তার অসম্পূর্ণ কিছু অংশ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, যার থেকে আমরা অ্যারিসটটলের শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধে জানতে পারি।

অ্যারিসটটলের মতে মানুষের লক্ষ্য আর শিক্ষার লক্ষ্য অভিন্ন। আনন্দের উৎস সন্ধানে ছুটে চলেছে মানুষ। সেই আনন্দ লুকিয়ে থাকে মুক্তির মধ্যে। মুক্তি-স্বাধীনতা ছাড়া আনন্দ উপলব্ধি করা অসম্ভব। শিক্ষার লক্ষ্যও মুক্তি। লেজ্যার বা অবকাশ–অবসর আমাদের জীবনে আনে সেই মুক্তির স্বাদ, সেই স্বাধীনতা। মুক্ত মনে আমরা ভাবতে পারি, সেই সব কাজ করতে পারি যা 'মানুষ' হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। মানুষ সত্ত্বাকে প্রকাশিত করাই শিক্ষার অবদান – মানুষ হিসাবে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে ওঠে মানব জীবনে সেই অবসর– সেই মুক্তি বা স্বাধীনতাকে হাজির করা। মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে প্রকৃতি, অভ্যাস আর যুক্তিবিচারের খেলা। মানুষ প্রাণী জগতের অর্ন্তভুক্ত হলেও পশু পাখির তুলনায় কোথাও অনেকটা আলাদা। পশুদের মধ্যে প্রাকৃতিক গুণাবলীর দেখা মেলে এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণেই তাদের জীবন চলে। কোন কোন পশুর মধ্যে অভ্যাস বা প্রাকৃতিক গুণগুলির চর্চ্চা করতে দেখা যায়। মানুষও জন্মসূত্রে প্রকৃতিদত্ত কিছু গুণ নিয়ে জন্মায়। সেই সব গুণ অভ্যাস বা চর্চ্চার মাধ্যমে ভালো বা মন্দ রূপ নেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে

রয়েছে যুক্তি বিচারের ক্ষমতা, যা তাকে পশুত্ব থেকে উদ্ধার করে। শিক্ষার হাত ধরে মানুষের মধ্যেকার প্রকৃতিগত গুণ, অভ্যাস আর যুক্তিবিচার– এই তিনটির মধ্যে তৈরি হয় এক সমন্বয়। তাই মানুষ তার প্রকৃতি ও অভ্যাসের বাধা ডিঙিয়ে কেবলমাত্র যুক্তির নির্দেশে কাজ করতে পারে। অ্যারিসটটলের একটি বিখ্যাত উক্তি "মানুষ হলো এক রাজনৈতিক প্রাণী"। যে মানুষ সমাজে বাস করে না বা যে মানুষ তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার দোহাই দিয়ে সমাজবদ্ধ হতে চায় না, সে আদতে একজন পশু কিংবা সে ঈশ্বর। সেই মানুষ রাষ্ট্রের অংশ নয়। তাই অ্যারিসটটলের শিক্ষাতত্ত্বে রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি, নীতিশাস্ত্র বিশেষ মাত্রা পায়। অ্যারিসটটল তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে জীবনভর শিক্ষাক্রমের কথা বলে গেছেন। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার আধার এক আদর্শ গ্রিক নগর– রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নাগরিক জীবনে আনন্দ, স্বচ্ছলতার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার হাত ধরে গড়ে ওঠা এক নাগরিক গোষ্ঠী এই রাষ্ট্রের বাসিন্দা। তারা রাষ্ট্রের প্রশাসন ঘিরে নানান ভূমিকা পালন করে। কেউ আদেশ – নির্দেশ জারি করে, কেউ সেই আজ্ঞা মেনে চলে, আর কেউ বা ন্যায় বিচারে ব্যস্ত থাকে। আর নাগরিক –রাষ্ট্র কেন্দ্রিক এই কর্মকান্ডের পিছনে কাজ করে জীবন-ভর পড়া-শেখা-জানা সমন্বিত এক শিক্ষাব্যবস্থা। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরণের রাষ্ট্রকে স্থিতিশীলতা দেবে। শিক্ষার দায়ভার থাকবে রাষ্ট্রের অধিকারে। শিক্ষার পীঠস্থান হবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় নয়। পড়ুয়ারা যাবে রাষ্ট্রচালিত জনসাধারণের স্কুলে। অ্যারিসটটল তাঁর মাষ্টারমশাই প্লেটোর মতই ভেবেছেন। তাঁদের এই ভাবনা তাঁদের সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল। তখনকার গ্রীসে সমর-শিক্ষা আর শারীর শিক্ষা ছাড়া গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হত।

অ্যারিসটটল তাঁর যুগ পেরিয়ে শিক্ষায় গণতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর ভাবনা চিন্তায় কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। যেমন– সকলের সমান শিক্ষার আওতায় পড়ত কেবল গ্রীক নগর–রাষ্ট্রের নাগরিকরা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারত না গ্রীসের কৃষিজীবি শ্রেণীর মানুষ, কারিগর আর খুচরো দোকানিরা। কারিগরদের জন্য বিশেষ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলেছেন অ্যারিসটটল। দাস প্রথায় অভ্যস্ত গ্রীক সভ্যতায়, অ্যারিসটটল দাস শ্রমিকদের জন্য বিশেষ পড়াশোনার কথা বলেছেন। নারী-পুরুষকে সমান চোখে দেখতেন না অ্যারিসটটল। তাই জনসাধারণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েরা পড়তে লিখতে শিখলেও তাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিষয় ছিল সৌন্দর্য, মহত্ব, সংযম ও নির্লোভী কর্মমুখীতা।

শিক্ষার বিষয়বস্তু কী হবে তার ধারণাও দিয়ে গেছেন অ্যারিসটটল তাঁর লেখা "পলিটিক্স" বইটিতে। তাতে তাঁর মতামত হল জীবনে যা অর্জন করা প্রয়োজন তাই শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত এবং মনের বিকাশই হলো জীবনচর্চ্চার মূল বিষয়। বৃত্তি বা কায়িকশ্রম যার বিনিময়ে লোকে মজুরি পাবে, তাকে ভীষণ ছোট নজরে দেখেছেন অ্যারিসটটল। তাই কী শেখা -'র' তালিকায় ব্যাকরণ, পাটীগণিত, শরীরচর্চ্চা, সঙ্গীত

ও আঁকা স্থান পেয়েছে। তবে সঙ্গীত শিক্ষা অ্যারিসটটলের ভাবনায় বেশ উঁচু জায়গা নিয়েছে। সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষ সুন্দরকে চিনতে শেখে। সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে 'শোনা'র একটা বড়ো জায়গা থাকে তাই শিক্ষা বা পড়াশোনায় সঙ্গীতের ভূমিকাও অপরিসীম।

শারীর শিক্ষার প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মন ও শরীর দুটোই গঠিত হয়, এমনটাই মনে করতেন অ্যারিসটটল। তবে শরীর চর্চ্চা ও সঙ্গীত শিক্ষা দুটো ক্ষেত্রেই তিনি মধ্যপন্থার প্রবর্তক ছিলেন। কোন ধরণের বাড়াবাড়ি বা অত্যধিক পরিশ্রম পরিহার করার কথা বলেছেন। যতটুকু করলে মনের বিকাশ ঘটে, তিনি ঠিক ততটাই চর্চ্চা করার কথা বলেছেন। অ্যারিসটটলের মতে শিক্ষা কেবল শৈশব-কৈশোর-যৌবনে আটকে থাকবে না। জীবনভর চলবে এই শিক্ষা গ্রহণ। প্রাক স্কুল শিক্ষা শুরু হবে মা-বাবার হাত ধরে। সন্তান ধারণ করা, মায়ের গর্ভে থাকা-কালীন যত্ন-আত্তি সবই চলে আসে অ্যারিসটটলীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায়। নবজাতকের লালন-পালনও শিক্ষার অধিকারে পড়ে। বাচ্চা স্কুলে যাবে সাত বছরে। তার আগে চলবে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষাদান। যথেষ্ট ভেবে চিন্তে শিক্ষামূলক খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৭ বছরের আগে শিশু হবে পাঠদানের দর্শক। পাঠ শুরু হবে সাত বছর বয়সে। চলবে ২৪ বছর বয়স অব্দি। অ্যারিসটটলের লেখা হারিয়ে গেছে এখানে এসে। তবে জীবনভর শিক্ষার কথা বলেছেন তিনি। ৩০-৩৫ বছর বয়সে শরীর পূর্ণতা পায়, আর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগে ৪৯ বছর। এমনটাই বলেছেন অ্যারিসটটল।

অ্যারিসটটলের শিক্ষা পদ্ধতি বা পেডাগগি দুই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেছে–১) যুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা ২) অভ্যাস-এর মাধ্যমে শিক্ষা। অভ্যাস মানে যন্ত্রবৎ পুনরাবৃত্তি নয়। বরং অভ্যাস-এর অর্থ শিখন পদ্ধতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ। পড়ুয়াও সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। কোন কিছু করতে গেলে আমাদের শিখতে হবে। এবং এই শেখাটা হবে কাজ করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ বীণাবাদক হতে গেলে বীণা বাজাতে শিখতে হবে। এবং বীণা বাজিয়েই শিখতে হবে। এই পদ্ধতি নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রযোজ্য যে কোন কলা ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিখতে গেলে অভ্যাসের মাধ্যমেই শিখতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাও এই পদ্ধতিতে ঘটবে। অভ্যাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণতা পায় যুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার ছোঁয়ায়। বিজ্ঞান চর্চ্চায় এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির হাত ধরে আমরা বস্তু বা ঘটনার পিছনে যে কার্য-কারণ কাজ করে তার খোঁজ করি। যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি আমাদের তাত্ত্বিকতায় পৌঁছে দেয় আর অভ্যাসনির্ভর পদ্ধতি আমাদের প্রয়োগ ভিত্তিক চর্চ্চায় নিয়ে যায়।

দুটি ক্ষেত্রেই আনন্দ পাওয়াটাই মূল লক্ষ্য। অ্যারিসটটলের মতে মানুষ কিছু প্রকৃতিদত্ত প্রবণতা নিয়ে জন্মালেও, সে মানুষ হয়ে ওঠে শিক্ষার দৌলতে। শিক্ষা আর শিল্পকলা 'র' পরশ পাথরের ছোঁয়ায় তার খামতিগুলো পরিপূর্ণতা পায়।

(৫৫১ – ৪৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

কনফুসিয়াস

ইয়াং হুয়ান্যিন রচিত ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এক মাষ্টারমশাইয়ের ভাবনা – চিন্তা – দর্শন হয়ে উঠল এক বিশেষ সংস্কৃতি-সভ্যতার উৎস। পৃথিবীর মানচিত্রে তৈরি হলো "কনফুসিয়ান সংস্কৃতি এলাকা"। চিন, কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনামের মতো কয়েকটি দেশ জুড়ে তৈরি হলো এই এলাকা। এই দেশগুলির প্রথা–ঐতিহ্যে মিশে আছে কনফুসিয়ান বোধ। তাদের সাংস্কৃতিক আর শিক্ষার ইতিহাস তৈরি হয়েছে কনফুসিয়ান ধারণায়।

সাগর-পাহাড় পেরিয়ে চিনের কনফুসিয়াস বাতাস ঢুকে পড়েছিল এই দেশগুলির মাটিতে ঠিক যখন তাদের সমাজে ঘটছিল কোন না কোন পালা বদল। হয় সেখানে আদিম সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছিল দাস প্রথার সমাজে, না হয়, দাস প্রথার জায়গায় তৈরি হচ্ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। তাই-ই হয়েছিল কোরিয়া- জাপান-ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের দিনে কনফুসিয়ানিজম ঢুকে পড়ল। আজ থেকে প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে কোরিয়া আর ভিয়েতনামে কনফুসিয়াসের মতবাদ পৌঁছে যায়। আর কোরিয়া হয়ে তাঁর ভাবনা পৌঁছে যায় জাপানে। ভিয়েতনাম থেকে কনফুসিয়াসের দর্শন গিয়ে পৌঁছায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো একগুচ্ছ দেশে। কনফুসিয়াসকে ভিত্তি করে এই সব দেশে তৈরি হয় তাদের জাতীয় প্রথা-ঐতিহ্য।

কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনামের প্রসঙ্গে বলা যায় যে যখন তাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বদল ঘটছিল, তখন দেশগুলিতে না ছিল লিখিত ভাষা (লিপি), না ছিল বই পত্র প্রকাশনার ব্যবস্থা। কনফুসিয়ান ধ্যান-ধারণার প্রয়োগের ফলে, কনফুসিয়াসের লেখা রচনাগুলির হাত ধরে ওই দেশগুলির ভাষায় ব্যবহৃত হলো চাইনিজ লিপি চিহ্নগুলি, প্রকাশিত হলো বইপত্র। চাইনিজ ধারায় বসল স্কুল ব্যবস্থা। ১৬০০ শতকে জেসুইট মিশনারীদের হাত ধরে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা গিয়ে পৌঁছয় ইউরোপে। সেখানে তখন শুরু হয়েছে মধ্যবিত্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর জাগরণ। স্বৈরাচার আর দৈবের দোহাই দিয়ে শাসনতন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলার তোড়জোড় চলছে। সে সময়ের ইউরোপিয়ান দার্শনিকেরা কনফুসিয়াসের লেখায় তাঁদের মতামতের সমর্থন খুঁজে পান। রাজনীতিতে নৈতিকতা, অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গুরুত্ব, দর্শনে নন্দনতত্ত্ব – প্রভৃতি কনফুসিয়াসের ধারণাগুলি ইউরোপিয়ানদের প্রভাবিত করে।

একটা মজার ধারা লক্ষ্য করা যায়। জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে যখন কনফুসিয়ানিজম পৌঁছয়, তখন সেই দেশগুলিতে চলছিল ভয়ানক আলোড়ন, উত্থান। দেখা যাচ্ছে, যে সময়ে কনফুসিয়াসের মনে চিন্তা-ভাবনা-দর্শন দানা বাঁধছে, তখন তাঁর চারপাশে চলছে ভয়ানক আন্দোলন, পরিবর্ত্তনের ঢেউ। দীর্ঘদিনের জাও রাজবংশের একচেটিয়া আধিপত্য ভেঙ্গে তৈরি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। সময়টা ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

বহু বিদ্যার অধিকারী কনফুসিয়াস এই পরিবর্ত্তনকে কাজে লাগান। এত দিন অভিজাত ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অধিকারে ছিল শিক্ষা। রাজনীতি আর অর্থনীতির গাঁথনিতে "প্রশাসনের জন্য আর প্রশাসনের দ্বারা শিক্ষা" কে বেঁধে রাখা ছিল। সামন্ততন্ত্রের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাতে সেই ভিত গেল নড়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি জনগণের বিষয় হয়ে উঠতে থাকলো। কনফুসিয়াস সময়ের স্রোতে ভেসে চললেন। তৈরি করলেন স্কুল, যেখানে ধনী, দরিদ্র সব্বাই সমানভাবে পড়াশোনা শিখবে। কনফুসিয়াস খুলে দিলেন শিক্ষার দরজা, সকলের জন্য। "আমার শিক্ষা সকলের জন্য– এখানের কোন প্রভেদ নেই"। আর সেই থেকে অতীত চিনে সর্বজনীন শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়ে গেল। আর এর সঙ্গে শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক সংস্কার আর সংস্কৃতির বিস্তার। আর তখন কতই বা বয়স তরুণ কনফুসিয়াসের। ৩০ বছর বয়সেই ৩০০০ শিষ্য-পড়ুয়া ভিড় করে তাঁর স্কুলে। এদের মধ্যে ৭২ জন ছয়টি কলায় (আচার-প্রথা, সঙ্গীত, ধনুর্বিদ্যা, রথ-চালনা, হস্তাক্ষরবিদ্যা ও গণিত) বিশারদ হয়ে ওঠেন। উল্লেখ্য সে যুগে এই ছয়টি কলা ছিল শিক্ষালাভের বিষয়।

কনফুসিয়াস পরিচালিত স্কুলের শিক্ষারীতি, পঠন-পাঠনের মান, ভর্ত্তি হওয়ার ধরণ– সব কিছুই অদ্বিতীয় ছিল। কনফুসিয়াসের মতে সমাজ ও ব্যক্তি বিকাশে শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার দুটি কাজ-

১) নৈতিক নির্দেশনা

২) বুদ্ধির বিকাশ।

শিক্ষার হাত ধরে যে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পায় তার মূলে রয়েছে একটি সদ্গুণ – মানবতা। কনফুসিয়াসের কাছে মানবতার আর এক নাম সদাশয়তা। এই গুণটিই মানব সম্পর্কের আরও নানান গুণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন – শ্রদ্ধা, মহানতা, ধৈর্য, প্রাজ্ঞতা, করুণা, সাহস / শৌর্য, পরোপকার, অমায়িক আচরণ, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি। এত সব কিছুর উৎসে রয়েছে সদাশয়তা। গুণের প্রভাবে মানুষ একে অন্যের প্রতি আন্তরিক হয়ে ওঠে, পারস্পরিক সহানুভূতি দেখায়। একে অন্যের খেয়াল রাখে। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। ব্যক্তির মধ্যে এই সদাশয়তার চর্চ্চা হওয়া দরকার, আর তা হবে শিক্ষার হাত ধরে। এই শিক্ষার হাত ধরে ব্যক্তি-পরিবারের শান্তি সদ্ভাব ছড়িয়ে পড়বে সমাজে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ থাকবে

নিরাপদে। চারিদিকে শান্তি বিরাজ করবে। ব্যক্তির নৈতিক মানে উন্নতি সাধিত হলে সমাজেও নৈতিকতা উন্নত হয়। এমনটাই বিশ্বাস করেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার শিক্ষক সমাজ ও রাজনৈতিক নেতারা। শিক্ষার প্রভাবে দেশে দেশে শান্তি আসে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

শিক্ষার দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ– সে বিষয়েও কনফুসিয়াস সমান গুরুত্ব দিতেন। শিক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে সংস্কৃতিবোধ, দক্ষতা ও সার্মথ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর জন্য তিনি ছয়টি ম্যানুয়েল লিখে গেছেন। প্রত্যেকটি রচনায় সমাজ সম্পর্ক ও নৈতিকতার সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের চর্চ্চা করা হয়েছেঃ– দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সঙ্গীত চর্চ্চা। সামন্ততান্ত্রিক চিনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ম্যানুয়েলগুলো ২০০০ বছরের বেশি সময় ধরে বুনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছে, যা ১৯১৯– এর ৪ঠা মে 'র' আন্দোলনে প্রথম ধাক্কা খায়।

রাজনৈতিক ও নৈতিক নীতির উপর ভর করে থাকা কনফুসিয়ান শিক্ষাতত্ত্বের মূল লক্ষ্য "গুণের মানুষ" তৈরি করা। শিক্ষাক্রমে সেই সব বিষয় স্থান পেয়েছে যা সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করবে নাগরিক পরিষেবার দক্ষতাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ্য আধিকারিক। তাই ছয়টি কলার (আচার-প্রথা, সঙ্গীত, রথ-চালানো, ধর্নুবিদ্যা, হস্তাক্ষরবিদ্যা ও গণিত) চর্চ্চা গুরুত্ব পেয়েছিল। কৃষিকাজ, বাণিজ্য ও কায়িক শ্রম কনফুসিয়ান পাঠক্রমে স্থান পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়টি কোনক্রমে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় সুশাসনকে নিশ্চিত করতে কনফুসিয়াসের নীতি ছিল যোগ্য লোক বেছে নেওয়া। তাই শুরু হয়েছিল কর্মচারী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা। এই ব্যবস্থার ফলে বংশগত পরাম্পরায় উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রাচীন আভিজাত্যপূর্ণ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়। চিনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই নিয়ম যুগান্তকারী বলে গণ্য করা হয়। দেশে দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যোগ্যতা ভিত্তিক কর্ম নিযুক্তি ও যোগ্যতা এবং নৈতিকতা অর্জনের লক্ষ্যে চরিত্র গঠন আজও চিনদেশে বিশ্বাস হারায় নি।

কনফুসিয়াসের শিক্ষানীতির কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য লক্ষ্য ছিল

১) পড়ুয়ার শ্রবণতা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা.
২) পড়ুয়াকে শিখতে উৎসাহিত করা, সাহায্য করা
৩) ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
৪) অন্যকে শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজে শেখা
৫) বর্তমানকে অতীতের আলোয় বিচার করতে শেখা
৬) শিক্ষককেও পড়তে হবে, জানতে হবে– পড়তে ভালোবাসতে হবে
৭) তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগ-চর্চ্চা কে মেলানো

৮) স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দেওয়া
৯) নিজের ব্যক্তিগত আচরণ শিক্ষানীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কিনা পরখ করে নেওয়া
১০) পড়ুয়ার বয়স অনুসারে শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করা
১১) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শেখা
১২) ভালো উদাহরণ হিসেবে নিজেকে পেশ করা
১৩) নিজের ভুল শোধরানো, নিজের বিকাশ ঘটানো
১৪) মন্দকে খর্ব করে শুভ / ভালকে প্রকটিত করা
১৫) ভুল সংশোধনকে মুক্ত মনে গ্রহণ করতে শেখা
১৬) সমালোচনাকে গ্রহণ করতে পারা
১৭) অতীতের ভুল বোঝাবুঝি, সম্পর্কের মলিনতাকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

নীতিগুলো কনফুসিয়াস ভাবনা-চিন্তা করে তৈরি করলেও প্রতিদিনের জীবনচর্চ্চার মাধ্যমে সেগুলোকে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। তাই তো হয়ে উঠেছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম মাষ্টারমশাই।

শিক্ষক মানুষটাকে কেমন হতে হবে? কনফুসিয়াসের এ বিষয়ে স্পষ্ট মত ছিল। শিক্ষক হবেন বিবেকবান, সেই সঙ্গে থাকতে হবে অদম্য আবেগ। পড়ুয়ার উপকারে লাগতে হলে শিক্ষকের জ্ঞানের পরিসীমা বিস্তৃত হতে হবে, যথেষ্ট দখল থাকতে হবে। পড়ুয়াকে ভালোবাসতে হবে, তাদের মনের নানান চলন, বিশিষ্টতা সম্বন্ধে শিক্ষককে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। পাঠ্যবস্তুকে, জ্ঞানের বিষয়টাকে পড়ুয়ার কাছে পৌঁছে দিতে শিক্ষককে নানান উপায় বা পন্থার কথা ভাবতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে, যা পরবর্ত্তীতে যথাযথ পদ্ধতিতে রূপ নেবে। পড়ুয়ার উন্নতি, বিকাশই হলো শিক্ষকের ব্রত। শিক্ষকদের থাকতেই হবে রাজনৈতিক প্রত্যয়। শিক্ষক হবেন বিনয়ী, অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এক মানুষ। নিজের জ্ঞানকে তিনি জাহির করবেন না। শিক্ষক হবেন নিঃস্বার্থ। নিজেকে প্রকাশ করবেন প্রাণবন্তভাবে, চমৎকারভাবে। কথার সঙ্গে কাজের থাকবে মিল, শিক্ষক হবেন ন্যায়পরায়ণ। মজার কথা কনফুসিয়াস অর্থনীতিকে শিক্ষার উপরে স্থান দিয়েছেন। সুশাসনের লক্ষণ– সবার আগে দেশের স্বচ্ছলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তার সঙ্গে থাকবে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি।

তাঁর জীবদ্দশায় কনফুসিয়াস শিক্ষক হিসেবে তাঁর লক্ষ্যগুলি পূরণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু মৃত্যুর পরবর্ত্তী সময় জুড়ে চিনের সংস্কৃতি ও শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর অবদান অপরিসীম। সে অবদান ছড়িয়ে গেছে বিশ্বের অনেক দেশে।

(৮৭২-৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

আল ফারাবি

আমমার – আল – তালবির' লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ইসলামীয় সভ্যতার শুরু থেকেই দর্শন আর ধর্মমতের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এদিকে, মানুষ কী শিখবে, কীভাবে শিখবে অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হবে তা দর্শনের আওতায় পড়ে। ফলে দর্শন আর ধর্মচিন্তার মধ্যে যে লড়াই লক্ষ্য করা গেল তার প্রভাব গিয়ে পড়ল ইসলামীয় শিক্ষা ভাবনায়। শিক্ষা কী ও কেন তা নিয়ে ইসলাম ধর্মের আইনজ্ঞ ব্যক্তি ও দার্শনিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ অবস্থান করে সেটা আমরা ভালই বুঝতে পারি।

আল-ফারাবি এমন একজন দার্শনিক যিনি এই দ্বন্দ্ব দূর করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এমন একটা সময়ে তাঁর চিন্তা ভাবনা দানা বাঁধতে শুরু করে যখন ইসলামীয় দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়েছিল এক ভয়ানক তোলপাড়। তখন কেন্দ্রীয় খলিফা শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে কতগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। ধর্মমতের ফারাকের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আল-ফারাবি তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তৈরি করলেন। যা ইসলামীয় দর্শন ভাবনায় মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরেছিল। তাঁর গণতত্ত্বের ভিত্তি ছিল "বিশ্বজনীন যুক্তি বা বিচারশক্তি"। ইসলাম সংস্কৃতিতে তিনিই প্রথম যুক্তি বা লজিককে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৮৭২ সালে তুর্কিস্তানে ফারের রাজ্যে আল-ফারাবি জন্ম গ্রহণ করেন। পড়াশোনা করতে তিনি বাগদাদ যান। আর সেখানেই তিনি গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা (লজিক), দর্শন, সঙ্গীত, অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ নেন। প্লেটোর "রিপাব্লিক" পড়েন ও প্লেটোর লেখা ল'স (আইন) বইটির সারাংশ তৈরি করেন। শিক্ষা কী ও তার উদ্দেশ্য কী, কেমন ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হবে সে বিষয়ে আল-ফারাবির মনে সুচিন্তিত মতামত তৈরি হয়। ইসলামীয় চিন্তা ভাবনা ও রাজনীতিতে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে তাঁর দর্শন চিন্তা কাজে লাগে। আল-ফারাবির কাছে দর্শনশাস্ত্র পাঠ ছিল সবচাইতে উৎকৃষ্ট বিষয়। তাঁর মতে দর্শন মানুষকে সবচাইতে ভালো ভাবে ভালো জিনিস শিখতে শেখায়। তাঁর মতে দর্শনবিদ্যা মানুষকে আনন্দ অন্বেষণের দিকে চালিত করে।

আল-ফারাবির দর্শনতত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। আর তাঁর দর্শন তত্ত্বের ভিত্তি হলো প্রাকৃতিক নিয়মকানুন ও কোর-আন। আল-ফারাবির দর্শন ভাবনায় শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। তিনি শিক্ষাবিদ্যাকে একটি সামাজিক বিষয় হিসাবে দেখতেন।

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিসত্ত্বার সম্পর্ক রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই একজন ব্যক্তি সমাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নেয়। একান্ত নিজস্ব এক পরিপূর্ণতা অর্জন করার চেষ্টা চলে। আর এটা করতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষ লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে, বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যক্তি মানুষ শিক্ষা প্রক্রিয়ার হাত ধরে মূল্যবোধ গড়ে তোলে, আহরণ করে জ্ঞান ও দক্ষতা। শিক্ষার কাজ হলো ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতার চরম স্তরে পৌঁছে দেওয়া। আর লক্ষ্যপূরণ এনে দেয় এক অনাবিল আনন্দ। মানব অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো ওই "আনন্দের" হদিস পাওয়া। শিক্ষার হাত ধরে যে পরিপূর্ণতার দিকে আমরা এগিয়ে চলি, যে আনন্দের উৎসের দিকে এগিয়ে চলি, সেটাই জীবনের পরম ভালো, পরম শুভ।

"আল ইনসান আল কামিল"– এক পরিপূর্ণ মানব সত্তা। শিক্ষা গ্রহণের ফলে যার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটেছে। এমন মানুষ গড়ে উঠেছে যিনি পূর্ণাঙ্গরূপে নৈতিক আচরণের চর্চ্চা করেন। আর এই জ্ঞান ও মূল্যবোধকে হাতিয়ার করে এই পরিপূর্ণ মানুষ সমাজের সাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে তার সেই মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষিত হয়ে ওঠা মানে তেমনটি ভাবে বেঁচে থাকা। এমনটাই বিশ্বাস করতেন আল-ফারাবি। শিক্ষার স্পর্শে জ্ঞান, আনন্দ ও ভালো-বোধ এক হয়ে মিলে গিয়ে মানুষের আচরণে ব্যবহারে পূর্ণতা পায়। আল-ফারবি মনে করতেন শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলি চর্চ্চার স্থান হলো সমাজ। সমাজ ব্যক্তিকে লালন পালন করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো এক আদর্শ সমাজ তৈরি করা। এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক নাগরিক জীবন তাদের সদাচার আর নীতিবোধের সাহায্যে স্থিতিশীলতা ও শান্তি এনে দেবে। তিনি এমনও মনে করতেন যে শিক্ষার ফলে তৈরি হবে রাজনৈতিক নেতা। জাহাজের কাপ্তানের মতো এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথার্থ রীতি নীতির সাহায্যে দেশ-জাতি-সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা করা ছাড়াও দেশবাসীর মধ্যে "বহু জনহিতমূলক" কাজকর্ম উৎসাহিত করবেন, সাধারণের মধ্যে শুভবোধের উন্মেষ ঘটাবেন। শিক্ষা হতে জাত মুল্যবোধগুলি দু ধরণের। প্রথমশক্তি যৌক্তিক যেমন– প্রাজ্ঞতা, সাধারণ বোধ/ বুদ্ধি, উপস্থিত বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি। আর নৈতিক মূল্যবোধগুলি হলো– সাহস, ঔদার্য, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসচেতনতা। এছাড়াও শিক্ষা থেকে উদ্ভুত জানা-বোঝা-শেখার সঙ্গে সঙ্গে যা জানলাম যা বুঝলাম যা শিখলাম তার একটা ব্যবহারিক, প্রায়োগিক দিক থাকতেই হবে। এমনটাই মনে করতেন আল-ফারাবি। জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্য হলো তা ব্যবহার করা। বিজ্ঞান শিক্ষা যদি প্রাত্যহিক জীবিনে ব্যবহৃত না হয় তবে তার কোনও মূল্য নেই। শিক্ষা নিয়ে আল-ফারাবি কোন বিশেষ বই না লিখলেও, শিক্ষা নিয়ে তাঁর নানান লেখা থেকে পাঠক্রম ও পাঠদান পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। ভাষা শিক্ষার উপর আল-ফারাবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে সে বিষয়ে

তাঁর নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে। পড়ুয়ার পাঠ শুরু হবে ভাষা ও তার গঠন বিষয়ে। ভাষার উপর দখল তৈরি হয়েই তবে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান চর্চ্চা সম্ভব হয়। এরপর আসে লজিক বা যুক্তিবিদ্যার চর্চ্চা। যা পরবর্ত্তী পর্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এরপর আসে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা যা আরম্ভ হবে পাটিগণিত দিয়ে। তারপর আসবে জ্যামিতি ও আলজেব্রা শিক্ষা। গণিত পাঠের মাধ্যমে সংখ্যা ও পরিমাপের চর্চ্চা করতে করতে পড়ুয়ার মধ্যে ভাবনা-চিন্তা, স্পষ্টতা ও যথাযথতার বোধ প্রোথিত হয়। এরপর আসবে জ্যোর্তিবিদ্যা, সঙ্গীত, গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যার মতো বিষয়গুলি। ধীরে ধীরে পদার্থকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠশুরু হবে। যার উপজীব্য বিষয় হলো যে কোন ধরণের পদার্থ ও তার গুণাগুণ যেমন- (প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ)। এরপর আসবে ঈশ্বরতত্ত্ব, সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র। তারপর আসবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মবিচারশাস্ত্র, আইন বিষয়ক শাস্ত্র (ফিক) ও ঈশ্বরতত্ত্ব (কালাম) শিক্ষার স্থান একদম শেষে।

পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আল-ফারাবি বলেছেন যে মানব প্রকৃতি অর্থাৎ কিছু সহজাত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার প্রাকার দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মানবসত্তা কিছু ক্ষমতা প্রবণতা নিয়েই এই পৃথিবীতে আসে। জ্ঞান আহরণে এই ক্ষমতা কাজে লাগে। আল-ফারাবির শিক্ষা পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় উপলব্ধি এক মূখ্য ভূমিকা নেয়। জ্ঞান আহরণ শুরু হয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এরপর কল্পনাশক্তির সাহায্যে সেই আহরিত জ্ঞান, বুদ্ধিগত ধারণায় রূপান্তরিত হয়। আল-ফারাবির মতে পাঠদান শুরু হয় যখন বিষয় বা বস্তুটির অর্থ বা মানে মনের ভিতরে গেঁথে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। মনের মধ্যে অর্থ গেঁথে গেলেই আমরা পাঠ্যবস্তু / বিষয়টিকে বুঝতে পারি এবং এই বুঝে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয় পাঠ্যবস্তু / বিষয়টিকে গ্রহণ করা। অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধি পাঠ্যবিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারছে। পাঠ্যবস্তুকে উপলব্ধি বা বোধ্যগম্য করে তোলার জন্য দুই ধরণের পন্থার কথা বলেছেন। একটি হলো – যুক্তি পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা পাঠ্যবিষয়টি সম্বন্ধে পড়ুয়ার মনে জায়গা তৈরি করে দেওয়া। বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপনা করা হবে যাতে তা পড়ুয়ার মন জয় করবে। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো– প্রদর্শন বা নির্দেশনমূলক পদ্ধতির সাহায্যে পাঠ্যবিষয়টির ব্যাখ্যা করা, বুঝিয়ে দেওয়া, কারা পড়ছে অর্থাৎ পড়ুয়ার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও কী পড়ানো হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে পাঠদানের পদ্ধতি দুটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ মানুষ, যাদের জীবনচর্চ্চা ততটা সুবিধেজনক নয়, তাদের পড়াতে গেলে পাঠ্য বিষয়টিকে তাদের বোধ অনুসারে মনোগ্রাহী করে তুলতে হবে, যাতে পাঠশেষে তারা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে। সে তুলনায় সমাজের সুবিধাভোগী, সেরা পড়ুয়াদের জন্য ব্যাখ্যাধর্মী নির্দেশক (ডেমনস্ট্রেটিভ) পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আল-ফারাবি বৈজ্ঞানিক কথোপকথন পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলেছেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেখানে জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি হাতে কলমে যন্ত্র

বানানোর কথা বলেছেন। সাঙ্গীতিক যন্ত্র তৈরি করতে করতে পড়ুয়ার সঙ্গীত চর্চ্চা সম্ভব হয়। আল-ফারাবি নিজেই তানবুর (বাগদাদ ড্রাম) ও রাবাব (এক ধরণের যন্ত্র) নিয়ে কাজ করাছেন। শিক্ষাতত্ত্বে খেলাধুলার ভূমিকার কথা বলেছেন আল-ফারাবি। শিক্ষামূলক খেলাধুলার চর্চ্চা করার কথা বলেছেন। প্রত্যেকটি খেলার একটা লক্ষ্য থাকবে। খেলাধুলা যেমন মানসিক অবসাদ দূর করে এবং পড়ুয়াকে তার হারানো শক্তি ফেরত পেতে সাহায্য করে। তাকে পরবর্ত্তী ধাপের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে এমন সব খেলাধুলা চর্চ্চার কথা বলে গেছেন আল-ফারাবি।

এমনতর শিক্ষাক্রমে শিক্ষক ও পড়ুয়ারা কেমন হবে? শিক্ষক কেমন হবে বলতে গিয়ে আল-ফারাবি বলেছেন– শিক্ষক হবে সৎ চরিত্রের, নিলোর্ভী একজন মানুষ। সত্য অন্বেষণই হবে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়াও তাঁর থাকবেঃ- বিষয়গত দক্ষতা, বিষয়টি পরিবেশন করার ক্ষমতা, যা জানেন সেটা অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা। নিজের অধিগত বিদ্যাকে বিকৃত বা বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার বোধ ও ক্ষমতা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকতে হবে কয়েকটা গুণাবলীঃ-

১) পাঠ্য বিষয়টির অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা,
২) যা বুঝল তা হৃদয়ঙ্গম করা,
৩) যা জানল বুঝল সেটা বর্ণনা করতে পারা। সর্বোপরি থাকতে হবে শেখা-জানার আগ্রহ।

শিক্ষাদানে শাস্তি, প্রশংসা, উপস্থিতির কথা বলেছেন আল-ফারাবি। শিক্ষককে হতে হবে মধ্যপন্থি। কঠোরও হবেন না, আবার অতিরিক্ত উদারও নন। শিক্ষকের চেষ্টা থাকবে পড়ুয়ার মন্দ ব্যবহারকে ভালো ব্যবহারে প্রতিস্থাপিত করা। তার জন্য সময়মতো শাস্তি– প্রশংসামূলক উপহার দানের কথা বলে গেছেন। খুব বিশদ ভাবে বলেননি। বাকিটা ছেড়ে রেখেছেন পড়ুয়া ও শিক্ষকের বিচক্ষণতার উপর। মূল্যায়নের কথা বলতে গিয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যা পড়া হচ্ছে সেখানে পড়ুয়ার মান বা অবস্থান নির্ধারণের জন্যই পরীক্ষা নেওয়া দরকার। পড়ুয়া কতটা জেনেছে তা নিদর্শনকারী পরীক্ষা হতে পারে। আবার পদ্ধতিগত ভুলভ্রান্তি পরিমাপ করার জন্যও পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ–অনুমান-বিচার বিশ্লেষণী ক্ষমতার মূল্যায়ন করে। গাণিতিক ক্ষমতা, বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ ও পরীক্ষার বিষয় হতে পারে।

আল-ফারাবির শিক্ষাতত্ত্বে এক অখন্ড ব্যক্তি বিকশিত হয়ে ওঠার কথা বলা আছে– যে ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগতভাবে, ন্যায়বোধে, সৌন্দর্যবোধে, প্রায়োগিক ক্ষমতায় পরিপূর্ণ। আজকের শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্য বস্তুকে অবহেলা করতে পারে না।

(১০৫৮- ১১১১ খ্রিস্টাব্দ)

আল গাজালি

নবিল নোফাল-এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

মানুষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি ? আল-গাজালিকে প্রশ্নটা করলে উত্তর মিলবে সচেতনতা আর জ্ঞান। জ্ঞানের উৎস কী ? প্রশ্ন করলে আল-গাজালি বলবেনঃ জ্ঞানের উৎস দুটি। একধরণের জ্ঞান আহরণ করি আমাদের ইন্দ্রিয়, যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে, যার সাহায্যে বাস্তব জগতকে মানুষ জানতে চেষ্টা করে। আর দ্বিতীয় উৎসটি হল মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দৈব গুণাবলী, যা অদেখা-অজানা জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে, তাকে অদেখা-অজানা জানতে ব্রতী করে। আল-গাজালির কাছে সেই জ্ঞানই সত্য যা ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে, আত্মকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়। শিক্ষাবিদ আল-গাজালির কাছে পড়াশোনা আর অনুশীলনের উদ্দেশ্য মানবজমিনের চাষ আবাদ করা।

আল-গাজালির দুটি সত্তা নজরে আসে প্রথমটা ধর্মপ্রাণ শিক্ষাগুরু, যার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা হল আরাধনা – ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার পথ। ঈশ্বরের দুনিয়ায় পা রাখতে চাওয়া মানুষকে গড়েপিটে নিতে হবে – ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, বিনয়, ঔদার্য্য, ভদ্রতা, নৈতিকতা, সত্যপরায়ণতার বোধগুলি দিয়ে। ইন্দ্রিয় আর যুক্তি গ্রাহ্য জ্ঞানের পথ আর ঈশ্বরকে জানার জন্য জ্ঞানের পথদুটি ভিন্ন এমনটাই মনে করতেন তিনি। কিন্তু দ্বান্দ্বিক ছিলেন না। তাই ধর্মশিক্ষায় বিশ্বাসী আল-গাজালির শিক্ষা– চিন্তায় ছিল বিরোধ দূর করার সুর। আল-গাজালি যখন পড়াশনা করেছেন আর শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন তখন ইসলাম ধর্ম ও সভ্যতায় গড়ে উঠেছিল ধর্মকে নির্ভর করে একটি অন্য ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষার মূল বিষয় ছিল – কোরান পাঠ ও তার বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও তার ব্যবহারশাস্ত্র শেখা। আল-গাজালি তাই পড়েই মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়েছেন। এমনকি ইসলাম ধর্মীয় আইন, সুফিবাদ নিয়ে শিক্ষানবিশের কাজও করেছেন। বাগদাদের বিখ্যাত নিজাযিয়া মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতার কাজও করেন।

কোরান, আর নবীর ঐতিহ্যবাহী গল্প-গাথা, ইসলামী আইন শাস্ত্র, আর এগুলোকে ঘিরে ওঠা ভাষাতত্ত্ব পড়াশোনা করা ছিল তখনকার সমাজের রেওয়াজ। এগুলিকে বলা হত "আরব বিজ্ঞান"। ধীরে ধীরে সমসাময়িক গ্রীক সংস্কৃতি–সভ্যতা–শিক্ষার ঢেউ আসতে শুরু করে ছিল আরব সভ্যতা– সংস্কৃতি–শিক্ষার দোরগোড়ায়। চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, অঙ্ক, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা– এইসব বিষয়গুলির চর্চাও তখন চলছে। বিদেশী অ-আরব বিজ্ঞান, চর্চা বনাম ইসলামী আরব– বিজ্ঞান চর্চার লড়াই। আল-গাজালি

পড়ে ফেললেন অ্যারিসটটল, প্লেটো, প্লাটোনিস-এর দার্শনিক ভাবনাগুলি।

ইসলাম ধর্মের আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত বনাম দার্শনিকের লড়াইয়ে আল-গাজালি পক্ষ নেন ধর্মীয় আইনশাস্ত্রের পণ্ডিতদের পক্ষে। দর্শন তাঁর কাছে ততদূর যথার্থ যতদূর তা ইসলাম ধর্মের নীতির সঙ্গে সহমতে চলে, যেখান থেকে মতান্তর শুরু, দর্শনের যথার্থ তা সেখান থেকেই খতম। এই বলে আল-গাজালি বিরোধী, যুযুধান দুইপক্ষের ইতি টানেন। মজার কথা দর্শনের বিপক্ষে থেকেও দর্শন বিষয়ে, প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর লেখা বকলমে তাদের জয়গানই গায়। এমনটাই হয়েছে ১৯ শতকের শেষের দিকে। কায়রো শহরের বিখ্যাত শহরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহার। ইসলামী দুনিয়ায় ধর্মীয় শাস্ত্রের পীঠস্থান বলে মনে করা হয়। এহেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ানোর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম শিক্ষার আদর্শের যে কোন সংঘাত নেই সেটা বোঝাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ আল-গাজালির "প্রকৃতি বিজ্ঞান" বিষয়ক লেখারই অবতারণা করেন। খুরাসান প্রদেশের তুস শহরে এক পারস্য পরিবারে আল-গাজালির জন্ম হয় ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে। পরিবারে সুফীবাদের প্রভাব ছিল, যা পরে আল-খাজালিকে প্রভাবিত করে। শিক্ষাবিদ আল-গাজালি আর সুফীধর্ম বিশ্বাসী গাজালি মিলে মিশে থেকেছেন তা শিক্ষা, শিক্ষক–পড়ুয়া আর পাঠক্রম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ভাবনায়। আল-গাজালি ধর্মপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ মন শিক্ষকের উপায় হিসাবে ভাবতেন। যার সাহায্যে মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলা যায়, ঈশ্বর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়। পার্থিব আর যা কিছু ধনদৌলত, ক্ষমতা, সামাজিক সম্মান, এমনকি জ্ঞান পিপাসাকেও মায়া, ক্ষণস্থায়ী মনে করতেন। ছোট বয়সে শিশুকে মকতব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানোর পক্ষপাতী ছিলেন। শিশুর আচার আচরণ ব্যক্তিত্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে বাবা-মা এবং শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য এমনটাই মনে করতেন তিনি। ছোট বয়স থেকে শিশুকে ঈশ্বরের পথে ঠেলে দেওয়া, ধর্মপথে এগিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। সুফিবাদী আল-গাজালি চেয়েছেন নির্লোভী, নির্মোহী, সাত্ত্বিক ভাবধারায় শিশুরা যাতে শিক্ষিত হয়ে ওঠে। শিশু মনের উৎসাহ, উদ্দীপনা সময়ের সাথে সাথে বদলাতে থাকে। এই বয়সে যে শিশু খেলনাতে আকৃষ্ট হয়, সেই হয়তো আরেকটু বড় বয়সে জামা-কাপড় বেশভূষায় আকর্ষণ বোধ করে। তাই শিক্ষকদের জানা উচিত কোন বয়সে কোন বিষয় অনুপ্রেরণা জোগাবে, যাতে তারা বিদ্যালয়মূখী হয়ে ওঠে। শিক্ষা মানে তো আর কেবল মানের প্রশিক্ষণ নয়, নয় কেবল তত্ত্ব জোগানের উপায়। শিক্ষার বিচরণ পড়ুয়ার সমগ্র ব্যক্তিত্ব জুড়ে। তাই বুদ্ধি, ধর্ম-ভাব, ন্যায়-অন্যায় বোধ আর শারীরিক গঠন-সবেতেই যেন শিক্ষার ছাপ পড়ে। তাছাড়া শিক্ষার মুল লক্ষ্য কেবলমাত্র তাত্ত্বিক শেখা জানা নয়। শেখাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে, চর্চা করতে হবে। যথার্থ শিক্ষা পড়ুয়ার আচার আচরণে প্রভাব ফেলে। যার ফলে পড়ুয়া আহরিত জ্ঞানকে বাস্তবে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়।

সুফিবাদী ধার্মিক মানসিকতা অনুযায়ী আল-গাজালি মনে করতেন যে প্রলোভনের জাগতিক আকর্ষণ থেকে পড়ুয়াকে বের করে এনে তাকে অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত করানো দরকার, যাতে সে হয়ে ওঠে বিনয়ী এবং কঠোর জীবন যাপনে সে হয়ে ওঠে নির্ভীক। আর ওদিকে তাঁর শিক্ষাবিদ্ মন মনে করত, বিদ্যালয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজলেই তাদের মুক্ত করে দিতে হবে খেলার জগতে। যাতে খেলাধূলোর উত্তেজনা পড়ুয়ার মনে ক্লান্তি দূর করতে পারে, সারাদিনের পড়াশোনার বোঝা সরিয়ে মন হাল্কা হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তা বুঝতেন আল-গাজালি। প্রত্যেকটি মানুষ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য অনুসারে ভিন্ন। শিক্ষক যেন সেটা মনে রাখেন এবং পড়ুয়ার সঙ্গে শিক্ষকের আচরণ যেন সেই মতো হয়। জ্ঞান যেন কারুর কাছে বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। কে কতটা শিখবে তা নির্ভর করে পড়ুয়ার সামর্থ্যের উপর। শিক্ষকের সেটা যেন খেয়াল থাকে।

শিক্ষাবিদ আল-গাজালিকে টপকে যায় সুফীবাদী ধার্মিক আল-গাজালি, যখন সঙ্গীত আর ছবি আঁকার প্রসঙ্গ ওঠে। নাচ, গান, আঁকার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। অথচ শিক্ষা বিজ্ঞানের সাধারণ নীতি মেনে শুভ বোধ আর সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন কোন বস্তুকে তার সম্পূর্ণতা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারাকেই সৌন্দর্য আর গুণ বলে।

তাঁর ভাবনা চিন্তা অনেকটাই শিক্ষক পড়ুয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলে। তাঁর মতে শিক্ষা দান করা কেবল মাত্র শিক্ষক আর পণ্ডিতদের কাজ নয়। কেউ কিছু শিখে থাকলে অমনি তার কর্তব্য তৈরি হয় অন্যকে শেখানোর। শিক্ষকেরা শেখাবেন নিজেদের উদাহরণ দিয়ে, নিজের মডেল হয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষক যখন শেখাবেন তখন পড়ুয়ার-শিক্ষকদের এই আদান প্রদানে দুইজনেরই উপকার হয়।

স্কুল শিক্ষকদের কিছু গুণ আহরণের কথা বলে গেছেন আল-গাজালি। শিক্ষকেরা হবেন জাগতিক ঐশ্বর্য পরিত্যাগী, ভক্তপ্রাণ অথচ পণ্ডিত, মিতব্যয়ী, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। আল-গাজালির ইসলামীয় শিক্ষা ভাবনার প্রভাব বিগত নয় শতক ধরে ইসলামীয় ধর্ম চিন্তা ভাবনা ও চর্চাকে প্রভাবিত করে রেখেছিল। গত তিন দশক ধরে ইসলামীয় ধর্ম চিন্তায় এক নতুন জোয়ার এসেছে। এই চিন্তা প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক, প্রতিযোগী, লড়াই প্রিয়। আধুনিক সমাজ সভ্যতার সব কিছুকেই ইসলামের এই নতুন ভাবধারায় অধার্মিক বলে মনে করা হয়। আল-গাজালির বিরোধ দূর করা ইসলাম আর বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামের তর্জা চলছে। এই চিন্তার লড়াই আরব ও ইসলামী দুনিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতির রূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা যায়।

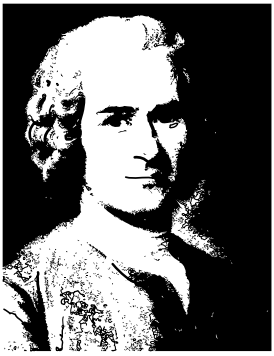

(১৭১২ – ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

জাঁ জাক রুশো

মাইকেল সোয়েটার্ড এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

নিজের চরিত্রের আপাত স্ববিরোধীতা প্রতিপন্ন করতে পছন্দ করতেন, সংস্কার মুক্ত মানুষটি। তাঁর ভবঘুরে, পরাশ্রয়ী জীবন যাপন একদিকে তাঁকে যেমন ভোগবাদী সংশয়ীর আখ্যা দেয় তেমনি, তাঁর মানুষের সেবা করার অদম্য স্পৃহা, মানব জীবনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, নৈরাজ্যের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা, ধর্মীয় বোধ থেকে নিয়ম-নীতির প্রতি টান, আমাদের সামনে এক অন্য রুশো কে এনে দাঁড় করায়।

শিক্ষা নিয়ে জাঁ জাক রুশোর চিন্তাভাবনার হেঁয়ালি নিজের সময়ে তো বটেই, তার পরবর্ত্তী প্রজন্মকেও ভাবিয়ে ছেড়েছে। তাবড় তাবড় শিক্ষাবিদ্‌রা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে রুশোর কল্পনাশ্রয়ী কাজ "এমিল" কে বার বার স্মরণ করেছেন। কেমন ছিল রুশোর ভাবনা?

শিক্ষা পদ্ধতিতে কোর্পানিকাস–সম বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন রুশো। সৌর জগতের কেন্দ্রে যেমন সূর্য, তেমনি শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে ফেললেন শিশুকে। আর বহু দিন ধরে উপেক্ষিত শৈশবের উপর পক্ষপাতিত্বের ঢেউ আছড়ে পড়ল। নানা ক্ষেত্রে তার ছাপ দেখা গেলঃ চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে শুরু করে নীতিবাগীশ, এমনকি শাসক-পরিচালক সবাই শিশুকে গুরুত্ব দিতে শুরু করল। এখানেই শোনা গেল রুশোর সাবধানবাণী। শিশু যেমন পাপের ফল নয়, তেমনি তাকে নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি যেন করা না হয়।

শিক্ষা নিয়ে রুশোর ভাবনা চিন্তা মূলত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখা এমিল গ্রন্থে। বইটি গবেষণা-ধর্মী উপন্যাস। প্রকাশিত হয় ১৭৬২ সালে। একটা বাচ্চা ছেলের বড় হয়ে ওঠার গল্প বলতে গিয়ে রুশো শিক্ষাপদ্ধতি–পেডাগজি সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা-চিন্তা জানিয়েছেন। এমিল লিখতে বসে রুশো তাঁর সমসাময়িক আর পূর্বসূরি শিক্ষাবিদ্‌দের কথা নানা ছলে বারবার বলেছেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তার স্বকীয়তা, তাঁর প্রতিভা, নতুনের প্রবর্তন নজর কাড়ে। শিক্ষাকে একদম নতুন চোখে দেখতে চেয়েছেন রুশো। পুরনো দুনিয়াটার এক ঐতিহাসিক স্থানচ্যুতি, একটা বদল ঘটতে চলেছে। আর শিক্ষা হলো সেই নতুন আকারের জগৎ। এমনটাই মনে করতেন রুশো। আর এখানেই তাঁর ভাবনার অভিনবত্ব। যখন আর সবাই "শিক্ষা উৎপাদনে" ব্যস্ত বা শিক্ষাকে হাতিয়ার করে নানা রূপের মানুষ (মানবতাবাদী, সৎ খ্রিস্টান, সুশীল নাগরিক

বা নিপাট ভদ্রলোক) তৈরি করতে সচেষ্ট, রুশো তখন বলছেন "আমি তাঁকে বাঁচতে শেখাবো। আমার এক্তিয়ার থেকে বেরিয়ে গিয়ে, হলফ করে বলতে পারি, সে না হবে মন্ত্রী, না হবে সান্ত্রী, না হবে পুরুত ঠাকুর। প্রাথমিকভাবে সে হবে একজন মানুষ"।

আসলে যে সময়টাতে রুশো তাঁর ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছিলেন সেটা ছিল টালমাটাল সময়। মানবতাবাদী আদর্শের আলো নিভু নিভু। মানুষ তার পরিবেশ-প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে থাকার পথ ছাড়ছে। মাথার উপর কর্তৃত্বকারীর শাসনে সন্তুষ্টির দিন শেষ। চাহিদা এবং আরও ভোগের ইচ্ছা মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ আরও, আরও অধিকার করতে চায়, আর সেই সঙ্গে ক্ষমতা লাভের দৌড়। সহজাত চাহিদা ছাপিয়ে, গোটা সমাজের বুননে নিজের স্বার্থ রক্ষার ছোঁয়াচ।

মানব সভ্যতা বলতে যে সব ফলকগুলোর কথা মনে আসে, যেমনঃ জ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, দর্শন সমস্তকিছুই সবলের ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়েছে। ১৭৫০ আর ১৭৫৫ তে লেখা দুটি প্রবন্ধে রুশো এইসব কথাই বলেছেন। মোক্ষলাভের বদলে জ্ঞানচর্চা এখন প্রতারণার নামান্তর। বিজ্ঞানের কাজ হলো আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা। শিল্প-কলা হলো নিজের গরিমা প্রকাশের উপায় আর দর্শন হলো অন্যের উপর প্রভুত্ব করার অভিলাষ। রুশোর লেখায় মানব সভ্যতার নানান সমাজ ব্যবস্থার কথা উঠে এসেছে। স্বার্থপরতার তাগিদে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কলুষতা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতির সন্তান ব্যক্তি মানুষ জোট বেঁধে সমাজ গড়ে তুলেছে।

তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, সমাজবদ্ধ হয়ে গণ ইচ্ছায় উত্তরণ ঘটেছে। কিন্তু স্বার্থপরতা, আত্ম-সুখের প্রচন্ড চাপে এই সমাজ অশান্ত লাটিমের মতো ঘুরে মরছে। তাহলে উপায়? আমরা কি হাল ছেড়ে বসে থাকব? এমিল গ্রন্থে রুশো এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এই গবেষণাধর্মী উপন্যাসে "মানুষের অকৃত্রিম ভালোত্বের" জয়গান গাওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষা যেন সেই নৌকা যা গ্লানি প্লাবিত মানবতাকে রক্ষা করবে। যেমনটি করেছিল বাইবেলে লেখা নোয়ার নৌকা। একাধারে ব্যক্তি মানুষ যেমন মুক্ত, স্বাধীন, তেমনি তার অস্তিত্বের মূল্য নির্ভর করে সমগ্র মানবজাতির প্রেক্ষিতে।

ব্যক্তির সঙ্গে বহু কে বা 'সব' কে মেলানোর জন্য প্রয়োজন একটা প্রক্রিয়া। শিক্ষা হলো সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে তৈরি হবে এমন এক মানব গোষ্ঠি যে থাকবে নিজের আয়ত্তে-স্বায়ত্তে। সে হবে স্বাধীন। এই মুক্তমানুষ তৈরি করবে তার বাঁচার পথের নিয়ম কানুন। রুশোর লেখা এমিলে শিক্ষা কোন নতুনতম আদর্শের কথা বলে না। মানব সভ্যতার মতো শিক্ষা এসে দাঁড়ায় বিরোধ-দ্বন্দ্বের চৌমাথায়। এখানে ধরা দেয় নানান দ্বন্দ্বঃ স্বাধীনতা বনাম চাহিদা; হৃদয় বনাম বুদ্ধি; ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র; জ্ঞান বনাম অভিজ্ঞতা। রুশোর মনও যে মূর্ত্তিমান দ্বন্দ্বের ফসল। আলোকপ্রাপ্তি যুগের মানুষ হলেও প্রখর যুক্তিবাদের প্রতি বিশ্বাস রুশোর ভিতর বাস করে।

রুশোর কাছে শিক্ষার কাজ হলো এই নানান বৈপরীত্য দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রন করা, পরিচালনা করার শিল্প বা উপায়। এই শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষের স্বনির্ভর স্বাধীনতা, যা থাকবে তার আয়ত্তে।

কেমন হবে এই শিক্ষাক্রমের শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্ক? পড়ুয়া কোনভাবেই শিক্ষকের অধীনে থাকবে না। তবে, এর অর্থ এই নয় যে পড়ুয়ার স্বেচ্ছাচারকে উৎসাহিত করা হবে। তাই প্রধান চরিত্র এমিলকে প্রতিনিয়ত তার ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। বাস্তবের সমস্যা দুঃখ যন্ত্রণার সামনা সামনি মোকাবিলা করতে করতে এমিল তার আত্ম-বোধ ও স্বায়ত্ত বোধ যাচাই করে নিতে পারে।

আর বাধা-অসুবিধে সমগ্র পথটিতে এমিলের পরিচালক-শিক্ষক তার ছায়া সঙ্গী হয়ে থাকেন। হতাশার মূহুর্তে উদ্দীপনা জোগায়, উৎসাহিত করে। অথচ এই কাজটা তিনি এমনভাবে করেন যাতে এমিলের উপর শিক্ষকের ইচ্ছা যেন কোন ভাবেই চেপে না বসে। এইভাবে স্বাধীনতা বনাম কর্তৃত্বের সংঘাতকে রুশো সমাধান করেন। একইভাবে জ্ঞান বনাম অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব নিয়েও এমিলের গল্পে চর্চা করা হয়। শিক্ষার সাহায্যে কেবল শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেই চলবে না, পড়ুয়া নিজে কী শিখতে চায়– কিভাবে শিখতে চায়–কী পড়তে চায়–কখন পড়তে চায়, সেটাও এই শিক্ষা পদ্ধতি খেয়াল রাখবে।

সমাজের কাজ হল এমন এক অনুকূল শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি করা যার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি মানুষের নাগালে স্বাধীনতা আর আত্মবোধ এনে দেওয়া। এই শিক্ষা পদ্ধতি কেবলমাত্র স্কুলের চৌহদ্দিতে আটকে থাকবে না। রুশোর মতে এই শিক্ষা প্রক্রিয়া স্কুল, পরিবার বা যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আগল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে বাইরের জগতে। ব্যক্তি অনুভূতিকে কেটে-কুটে ছিঁড়ে ফেলা সমাজের রক্ত চক্ষুকে কলা দেখিয়ে এই শিক্ষা মানুষকে মুক্ত করবে,স্বাধীন করবে। এই শিক্ষা পদ্ধতিকে সাকার দিতে শিক্ষক তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। যতই বাধা আসুক তা অতিক্রম করতে হবে। শিক্ষকের জীবনের লক্ষ্যই হবে পড়ুয়ার জন্য শিক্ষার পথ করে দেওয়া। রুশো লিখছেন " পড়ুয়া মনে করবে এই ধরণের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সে-ই সর্বেসর্বা। অথচ শিক্ষক জানেন তিনি-ই সব"। এমন প্রচ্ছন্ন থাকবে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ। কোনভাবেই যেন পড়ুয়ার স্বাধীনচেতাকে খর্ব করা না হয়। আবার, খেয়াল রাখতে হবে পড়ুয়া যেন স্বেচ্ছাচারের স্বাদ না পেয়ে যায়।

পড়ুয়া তার শিক্ষাকে কোন চোখে দেখবে? এমিল গ্রন্থে পড়ুয়া তার শিক্ষা গুরুকে ভালোবাসে, সমীহ করে, ভয়ও পায়। রুশোর শিক্ষা পদ্ধতিতে হৃদয় তার স্থান করে নিয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি, সংবেদনশীলতা আর আবেগ সমান জায়গা পেয়েছে।

এর সাথে রুশো দেখালেন যে শিক্ষা হলো বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বুঝে নেওয়ার বিষয়।

মানব প্রকৃতি বিকাশের ধারাকে, বিকাশের নকশাকে বুঝতে পারে শিক্ষা। রুশোর এই পথিকৃৎ ভাবনা ভবিষ্যতের শিক্ষাবিদ্‌দের মানব প্রকৃতি বিকাশের পথ নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিল। শিক্ষা যে একটা প্রায়োগিক পদ্ধতি, হাতে কলমে করতে হয়, তা এমিল গ্রন্থে খুব সুন্দর করে বলে গেছেন রুশো। প্রতি মূর্হুতে এমিলকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলা হয় যে সে থাকে সদাই সক্রিয়। আর এর ফলে তৈরি হওয়া অভিজ্ঞতার ঝুলির দিকে, জীবনের পথ চলতে গিয়ে বারবার সে ফিরে তাকায়। এমিল কে দিয়ে কায়িক শ্রম করানো হয়েছে। যে কাজের সামাজিক মূল্য রয়েছে। রুশোর শিক্ষা প্রক্রিয়ার কায়িক শ্রম মান্যতা লাভ করে।

রুশো বলছেন, মানুষ আদতে মুক্ত। তাঁর বলা শিক্ষাক্রমের লক্ষ্যই হল মানুষের মুক্তি। রুশো, আবার বলছেন, শিক্ষা হল হৃদয়ের ব্যাপার। আর এতে করে পড়ুয়ার প্রতি অতি স্নেহের ঝুঁকি রয়ে যায়, যা কিনা তার স্বাধীনতার গলা টিপে ধরে। রুশো বলছেন শিক্ষা হলো বুদ্ধির ব্যাপার। অতএব, কোন বিষয় শিখে ফেলা, আয়ত্ত করে ফেলাটাই শিক্ষার মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এবার রুশো বলছেন, যা যা দিয়ে বুঝব যে শেখার বিষয়টি আয়ত্ত করা গেছে, সে গুলিই তখন শিক্ষাদানের প্রধান ব্যাপার হয়ে ওঠার ভয় থেকে যায়।

আর শিক্ষাকে যদি প্রক্রিয়ার বিষয় বলা হয় তবে শিক্ষার উৎপাদনমুখী প্রযুক্তি হিসেবে পর্যবসিত হওয়ার ভয় থাকে। এ যেন প্রচলিত গানটার মতো " আমি রাঁধিব বাড়িব, ব্যঞ্জন বাড়িব, তবু আমি হাঁড়ি ছোঁব না"!

রুশোর শিক্ষা ভাবনায় এই আপাত স্ববিরোধতা আসলে শিক্ষাকে সংযত –সমতার মিশেল হিসেবে দেখার এক নির্দেশিকা। শিক্ষা যেন তার সবক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ ছাড়িয়ে না যায়। সবচেয়ে বেশি যেটা খেয়াল রাখা শিক্ষার আঘাতে যেন পড়ুয়ার সহজাত প্রকৃতি বাধা না পায়। এইভাবে রুশোর শিক্ষা ভাবনা আধুনিকতার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। এমিল উপন্যাসটি রুশোর শিক্ষা ভাবনার প্রতিভূ। এখানে রুশো এক স্বপ্নদ্রষ্টা, শিক্ষা নিয়ে যে স্বপ্ন দেখে। উপন্যাসের শেষে স্বপ্নটাকে যুক্তি নির্ভর উপসংহারে পৌঁছে দেয়।

আজও বাস্তবে যখন আমরা নানান শিক্ষা প্রকল্পগুলির অচল অবস্থা নিয়ে মাথা কুটে মরি, রুশোর শিক্ষা ভাবনা আজও আমাদের কিছু বলার জন্য এগিয়ে আসে। এখানেও রুশোর সেই অতি চেনা আপাত স্ববিরোধীতা কাজ করে চলে।

(১৭২৪ – ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ)

ইমানুয়েল কান্ট

হেনরিক কানজ-এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ইমানুয়েল কান্ট, ছিলেন লজিক, মেটাফিজিক্সের অধ্যাপক। দর্শন ছিল তাঁর বিদ্যা চর্চ্চার বিষয়। মানুষের বোঝার প্রক্রিয়া, উপলব্ধি করার বিষয়টি নিয়ে ছিল অগাধ ভাবনা-চিন্তা। " আমি কী জানতে পারি? আমি কী করতে পারি? মানুষ কী? আমি কী আশা করি?" প্রশ্নগুলি করতে করতে চলে তাঁর দর্শন চর্চ্চা। একদিকে বিশ্বাস করতেন যুক্তি –বিচার বুদ্ধি নির্ভর জ্ঞান চর্চ্চায়। আবার অপরদিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অভিজ্ঞতার বাইরেও যে জানা বোঝার জগৎ পড়ে থাকে তাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কান্ট জন্মেছিলেন ১৭২৪ সালে প্রুশিয়ার কোনিজসবার্গ (অধুনা কালিনিনগ্রাদ) শহরে।

শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা তাঁর দার্শনিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। মানুষ তাঁর কাছে সাবজেক্ট, যার মধ্যে নিহীত আছে বিচারবুদ্ধি, ভালো বা শুভর সবরকম বৈশিষ্ট্য। তাই মানুষ মানুষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তরূপে কখনই ব্যবহার করবে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে অন্যকে শোষণ করবে না। কাণ্ট যে সময়ে দার্শনিক চিন্তাভাবনায় রত রয়েছেন সেই সময়টাকে ইউরোপে "আলোকপ্রাপ্তির যুগ" বলে অভিহিত করা হয়। এই সময়জুড়ে মানুষের আত্ম-অন্বেষণকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করা হয়েছিল। নিজের সঙ্কল্প আর বিচার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে মানুষ তখন চিন্তা-ভাবনায় বিকশিত হয়ে উঠছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাতত্ত্ব বা "অন পেডাগগি" নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কাণ্ট– এর ভাবনায় চিন্তায় তার ছাপ। শিক্ষা কী? কার জন্য শিক্ষা? আলোকপ্রাপ্ত বিচার বোধ, যুক্তি বুদ্ধি কোন ধরণের শিক্ষার ছোঁয়ায় বিশ্বজনীন শান্তির সূত্র হয়ে উঠতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বক্তৃতা করেছিলেন কাণ্ট। মুক্তিকামীতার প্রতি মানুষের রয়েছে প্রবল ঝোঁক। প্রকৃতিগত ভাবে মানুষের মধ্যে বিচার –বুদ্ধি-যুক্তি অর্ন্তনিহিত থাকলেও, এগুলির ব্যবহারে মানুষ বড়ই অপরিণত। অন্যের পরামর্শ-নির্দেশিকা ছাড়া সাধারণভাবে মানুষ তার সুপ্ত বিচারবোধ প্রকটিত করতে পারে না। বিচারবোধকে সুপ্ত করে রাখার একটা বড়ো কারণ যথাযথ সঙ্কল্প ও সাহসের অভাব। আলোকপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার অর্থ নিজের বিচারবুদ্ধি- যুক্তিবুদ্ধিকে ব্যবহার করার জন্য সাহসী হয়ে ওঠা। এই আলোকময়তা মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেয়– যা তার কাছে চির আকাঙ্খিত। শিক্ষার সঙ্গে এই আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেণ্ট সম্পর্কিত। মানুষের মধ্যে নিহিত ভালো বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিশীলিত

করে তোলা হল শিক্ষা। মানুষ বলতে যে সমষ্টিগত আখ্যা কে আমরা বুঝি তা আসলে শিক্ষার দান, তার বেশি কিছু নয়। মানব প্রকৃতি পরিপূর্ণতা পায় সত্য ও যর্থাথ শিক্ষার পরশে। শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র চলতি সময়ের সঙ্গে খাপ খেতে শেখানো নয়।ভালো শিক্ষার লক্ষ্য হল জগৎসংসারের ভালো করা। ব্যক্তি মানুষ শিক্ষার রসে জারিত হয়ে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করবে।

শিক্ষার চারটি প্রধান কাজঃ –

১) নিয়ামানুগ চিন্তাভাবনা করতে পারা,

২) দৃষ্টিভঙ্গীর অনুশীলন করা,

৩) সভ্যতার বিকাশ ঘটানো,

৪) সততা, ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটানো।

এখানে ন্যায়পরায়ণতার অর্থ শিক্ষিত হয়ে ওঠা, ব্যক্তি শুভ বা ভালো কাজে বা উদ্দেশ্যে রত হতে শিখবে। শুভ বা ভালো নির্ধারিত হবে বহুজন জাতীয়'র' আদলে। কান্টের শিক্ষায় দায়বদ্ধতা, কত্তর্ব্যপালন, আজ্ঞার অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছে। শব্দগুলো পরপর সাজালে এইরকম চেহারা নেয়ঃ – শিক্ষার মাধ্যমে বিচারবুদ্ধির নির্দেশ জারি হয়। যে নির্দেশ বা আজ্ঞার অনুবর্তি হয়ে কোন কাজ কত্তর্ব্যবোধ থেকে পালন করা যা পরিশেষে মানব জাতির বিকাশে লাগবে। মানুষকে কাঙ্খিত মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

মানব মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে হলে শিশু শিক্ষা পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় খোলা রাখতে হবে– প্রত্যেক শিশুকে–

১) সব ধরণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করতে দিতে হবে। কেবলমাত্র সেইসব কাজ যা শিশুর ক্ষতি করবে এবং অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটাবে তাতে বাধা দেওয়া হবে।

২) শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে নিজের উদ্দেশ্য সাধন তখনই সম্ভব যখন সে অন্যদেরও তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতে দেয়।

৩) শিশুকে বুঝতে হবে যে সে তার স্বাধীনতা ব্যবহার করতে দায়বদ্ধ। তাকে স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্যই শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। অন্যের অধীনে, যত্নে থাকা তার কাঙ্খিত নয়।

শিশুকে নিয়ম শৃঙ্খলার শিক্ষা দিতে গিয়ে তার মৌলিক স্বাধীনতা বোধ যেন খর্ব করা না হয়। কাজ করার অভ্যাস করাতে গিয়ে শিশুকে খেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও তা দাসত্বের আকার নেবে না। কান্টের কত্তর্ব্যবোধের মধ্যে লুকিয়ে আছে আজকের বিশ্ব নাগরিকত্বের সংজ্ঞা।

ব্যক্তি স্বার্থের খেয়াল রাখতে গিয়ে সে যেন বিশ্বজনীন বোধকে বির্সজন না দেয়। বরং সবার স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জনের কথা বলেছেন কান্ট। সর্বোপরি শিক্ষা

শিশুকে ভাবতে শেখাবে।

ব্যক্তি স্বার্থ বনাম মানবতার কথা বলতে গিয়ে কান্টের চরম অনুজ্ঞা/ আদেশঃ– ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত বা উপায় হিসাবে মানুষকে ব্যবহার করা যাবে না। বরং নিজের মধ্যে যে মানবতা নিহিত রয়েছে তা নিজের কাজে এবং পরের কাজে তার পূর্ণব্যবহার করা। কারণ মানবতাই নিজে নিজের শেষ কথা। এই চরম অনুজ্ঞাকে অনুসরণ করা মানুষের কত্তর্ব্য। আর শান্তির লক্ষ্যে, মানুষকে এই অনুজ্ঞা পালনে শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষার কত্তর্ব্য।

পরিশেষে জানাই কান্ট মনে করতেন, মানুষকে যত সমস্যা বা প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয়, তার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন হলো সবচাইতে বড়ো ও কঠিনতম। কারণ একদিকে যেমন অর্ন্তদৃষ্টি বা কোন কিছুকে উপলব্ধি করার শক্তি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর, অপরদিকে শিক্ষা তেমন ভরসা করে অর্ন্তদৃষ্টিকে।

(১৭৭০ – ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ)

জর্জ হেগেল

জ ই প্লেইনস্-র লেখা ইংরাজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

জার্মান শব্দ "বিল্ডঙ্গ্"। একদিকে যেমন বিল্ডঙ্গ্ -এর অর্থ গঠন করা। আবার এই শব্দটির অর্থ শিক্ষা-আত্মচর্চা। হেগেল এই শব্দটাকে নানান ভাবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতি পাঠ থেকে শুরু করে সমাজ–সংস্কৃতি কে নিরীক্ষণ করা, তার বির্বতন ও নানা প্রকার বোঝার উপায় বলতে গিয়ে হেগেল "বিল্ডঙ্গ্" ব্যবহার করেছেন। জর্জ হেগেল । ১৯ শতকের দিক্পাল এক দার্শনিক। পাশ্চাত্য দর্শনের আর্দশবাদী ধারার প্রবক্তা হেগেল শিক্ষাকে এক বিপুল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতেন। শিক্ষার হাত ধরে মানব জীবন তার প্রাকৃত প্রবৃত্তি কাটিয়ে মানসিক ও নৈতিক পূর্ণতা অর্জন করে। সে পূর্ণতা প্রকাশিত হয় ব্যক্তি মনে, সমগ্র মানবজাতির মননে। আর সেই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আমাদের ধর্মাচরণে, শিল্প কলায়, বিজ্ঞান চর্চায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, হেগেলের ভাবনায় শিক্ষা একটা ঘটনা –বিস্তার। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাকে দেখতে চেয়েছেনঃ প্রাকৃতিক, মানসিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক। সেখান থেকে চলে গেছেন নন্দন তত্ত্বে, ধর্ম দর্শনে এমনকি যুক্তি বিদ্যায়। 'শিক্ষা বলতে এক নজরে আমরা যা বুঝি, তা নিয়ে হেগেলের মন্তব্যগুলি বড়ই ছড়ানো-ছেটানো,খেয়ালি ঠেকে।

হেগেলের লেখা নুরেমবার্গ পাঠ্য ও দার্শনিক বিদ্যার বিশ্বকোষে স্কুল শিক্ষা ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তার মতামত জানতে পারি। একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে হেগেল চরিত্র গঠনকারী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন না। তেমনটি হলে শিক্ষাক্রম হয়ে উঠবে উপদেশের পাহাড় আর ধুলোয় লুটোবে অর্ন্তদৃষ্টি, বিচক্ষণতা আর যুক্তি-বুদ্ধির মতো গুণগুলো। হেগেলের শিক্ষা তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্ম-মুখীনতা থেকে মুক্তি লাভ। কেবলমাত্র নিজেকে কেন্দ্র করে জীবনচর্চা নয়, সমূহ জ্ঞান ও সম্মিলিত ইচ্ছায় উন্নীত হওয়া, যা কিনা নৈতিক আচার-আচরণের, সংস্কৃতির ভিত্তি। তাই হেগেল বিশ্বাস করতেন সেই পেডাগজি বা শিক্ষা পদ্ধতি যা কিনা আমাদের আত্ম-সর্বস্ব মনটাকে গড়ে নেবে। শিক্ষার পরিস্থিতি কেমন হবে বলতে গিয়ে যিশু খ্রিষ্ঠের কথা বলেছেন। 'যা ভেবে যিশু তার শিক্ষার সাহায্যে শিষ্যদের মনগুলো গড়ে-পিটে নিতেন, পূর্ণতায় পৌঁছে দিতেন, ঠিক তেমনটি চাইতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষের মনে নৈতিকতার বোধ তৈরি করে দেওয়া। দেখা যাচ্ছে যে হেগেলের পেডাগজি মানুষের প্রাকৃত সত্তাকে স্বীকার করে নিয়ে তার পরিবর্ত্তন ঘটানোর কথা বলছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের প্রথম

প্রাকৃত সত্তা আধ্যাত্মিকতায় পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, যা ক্রমে তার দ্বিতীয় সত্তা হয়ে ওঠে। আর এই শিক্ষার স্বার্থেই মানুষকে শিখতে হবে তার ক্ষুদ্র আত্ম-স্বার্থ, তার একান্ত নিজস্ব খেয়াল খুশির খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে অন্যদের চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দিতে। আর সেটা করতে হবে যখন দেখা যাবে তার স্বার্থ চিন্তার তুলনায় সেই সব ভাবনা যখন শ্রেষ্ঠ। আর এই পেডাগজি/ শিক্ষা পদ্ধতির আলোতে আমরা দেখতে পাই শিক্ষা কী ভাবে ঘরের কোনে বাবা-মায়ের আল্লাদ-আদর অতিক্রম করে স্কুলের কঠোর অনুশাসনে বদলে যায়। স্কুলে এসেও বাচ্চা ভালোবাসা পায় তার সাথে মিশে থাকে সাধারণ নিয়ম নীতি মেনে চলার নির্দেশিকা। স্কুলের কাজ হলো এই সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো, শেখার উপকরণগুলো শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া। শিক্ষার কাজ কেবল মাত্র বাধাহীন প্রাকৃতিক ও মানসিক উন্নতি ঘটানো নয়, তার সাথে থাকবে সেই সুযোগ যেখানে পড়ুয়া তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে, সেই সঙ্গে উদার ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আচরণ করতে শিখবে। যার ফলে পড়ুয়া তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই ব্যবহার প্রতিফলিত করতে পারবে। হেগেলের কাছে শিক্ষা স্বাধীনতাকামী, মানব মনকে বিমুক্ত করে। শিক্ষার ছোঁয়ায়, শেখা-পড়া-জ্ঞান আহরণের ফলে ঘটে এক পরিবর্ত্তন, পরিমার্জন। অন্ধ প্রবৃত্তি, প্রাকৃতিক চাহিদা কে নিয়ন্ত্রন করতে শেখে। বিষয়ী-বাস্তব জীবনের তাৎক্ষণিকতার কোন্দর থেকে পড়ুয়ার মন বেরিয়ে পড়ে। তার মধ্যে তৈরি হয় সাধারণ নীতি- বিচার বোধের দৃষ্টিভঙ্গি। আর ধীরে ধীরে আসে উদ্দেশ্য-চিন্তা। যার ফলে ব্যক্তি মানুষ যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে, কাজ করতে পারে। চারপাশকে, পরিস্থিতিকে সে সার্বিকতা দিয়ে বিচার করতে পারে, ফলে তার বিচার, তার আচরণ হয় মুক্ত, স্বাধীন। আর তখনই তো "বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া" ।আর সেটাই তো শিক্ষার প্রতিফলন বা প্রতিফলনে শিক্ষা। যার আঁচ পাওয়া যাবে যখন দেখা যাবে দুনিয়া জুড়ে স্বার্থপরতা আর স্বার্থ-রক্ষার বদলে সাধারণ ন্যায়,কর্তব্য, অধিকার আর নীতির আধিপত্য। হেগেলের মতে "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"-নোর এই শিক্ষা প্রক্রিয়াটি বেশ কষ্ট সাধ্য, শ্রম সাপেক্ষ। হেগেলের মতে বাস্তব জগৎ - এর কাঠিন্যে, অচলায়তনে শিক্ষা এসে ধাক্কা খায়। শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা চর্চার এক বিরোধ তৈরি হয়। তৈরি হয় নিরাশা। তার প্রকাশ ঘটে দুভাবেঃ চরম বিদ্রোহ অথবা চরম অকর্মণ্যতায়। শিক্ষা তখন দর্শনের অবলম্বন খোঁজে। এই দ্বন্দ্ব-বিরোধ থেকে তৈরি হয় নতুন এক সংশ্লেষ যা বিরোধ থেকে উত্তরণ ঘটায়। মানুষের মন পূর্ণতা পেতে যে পথ ধরে চলে তার একটা পর্যায়ে থাকে শিক্ষা। শিক্ষার ফলে মনে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তার সমাধান ঘটে দর্শন চর্চায়।

(১৭৮২-১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)

ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবেল

হেলমুট হেইল্যান্ড-এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

একটা বাগান। ফুল গাছ, লতা পাতার মাঝে খেলাঘর, জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয় কিন্ডারগারডেন। শিশুরা ছুটছে, খেলছে, গাইছে, নাচছে। চারদিকে ছড়ানো খেলনাপাতি আর তিন প্যাঁটরা 'উপহার'। প্রথমটাতে সাত রঙা সুতোর বল। দ্বিতীয়টাতে রয়েছে নানান আকারে কাঠের তৈরি খন্ড। কোনটা বা গোলক, বেলনা আবার কোনোটা লুডোর ছক্কার আকারে। তৃতীয় উপহারের পেটিতে রয়েছে একটা বড় ছক্কা যাকে খাপে খাপে টুকরো করে ফেললে মিলবে আটখানা ছোট ছোট ছক্কা। এছাড়াও রয়েছে মজাদার সব বই। পাতা পাল্টালে ছবিগুলো বইয়ের পাতায় সেঁটে থাকার বদলে পাতা ছেড়ে উঠে আসে। বাচ্চারা বস্তু গুলো নাড়বে-চাড়বে, বিল্ডিং ব্লকস্ বা কাঠের তৈরি নির্মাণ খন্ডগুলো দিয়ে গড়বে নানান জিনিস। আর এই ভাবে খেলতে খেলতে শিশু নিজেই শিখে নেবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক, এক আকারের সমন্বয়। বড়োরাও থাকবে পাশে। তারাও শিশুদের সঙ্গে খেলা আর গড়ায় অংশ নেবেন। আর এর মধ্য দিয়ে শিশু-মন আকার পাবে। বুঝে নেবে খন্ডাংশের সঙ্গে সমগ্রতার-সম্পূর্ণতার সম্পর্ক। নিজের অন্তরের ভাবনাগুলো আকার পাবে, প্রকাশিত হবে। পাঠ্য বই এর বিজ্ঞান পড়ার মধ্যে দিয়ে নয়, খেলতে খেলতে, বস্তুর মৌলিক রূপগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শিশু জেনে যাবে বস্তুর গঠন, প্রকৃতি আর তাকে ঘিরে নিয়ম কানুন। এর ফলে শিখন সামগ্রীতে ঢুকে পড়ল নানান আকারের খেলনা। যিনি এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতির কথা বললেন তিনি নিজেই তৈরি করে ফেললেন এই খেলনা।

রোজকার নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারণের মধ্যে দিয়ে, নিজের চারপাশের জীব জগতে ঘটে চলা ঘটনারাশির সঙ্গে দেওয়া নেওয়া করতে করতে মানুষ জেনে যায় জীবজগত ও বস্তুজগতের গঠন নিয়ম। ব্যক্তি মনে আর তার চেতনায় যখন বাইরের বাস্তব জগত এসে মেশে, নিজের অন্তরে এই অস্তিত্বের বোধই হলো মানুষের আসল বিজ্ঞান চর্চা। এ বিশ্বে যত বস্তু আছে তার গঠন, প্রকৃতি, নিয়ম একমাত্র মানুষ তার চেতনা দিয়ে জানতে পারে, বুঝতে পারে। আর মানুষের এই বিশেষত্বের এই সত্য উদ্ঘাটিত হয় বস্তুকে বুঝতে গিয়েই। এটাই ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা তত্ত্ব। যে ভাবনায় বিজ্ঞান আর শিক্ষা মিলে মিশে থাকে। ফ্রোয়েবেলের মতো একজন স্ব-শিক্ষিত মানুষ ঘরের ধারে মাঠে-ঘাটে-বনের পথে ঘুরে বেড়াতেন আর প্রাকৃতিক বৈচিত্র

উপভোগ করতেন। প্রকৃতি পাঠের আসরে ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে নিতেন বাইবেলের পাতায় লেখা ঈশ্বরের বাণী। চেয়ে চেয়ে উপলবদ্ধি করতেন টিউলিপ ফুলের পাপড়ির গঠন। পাপড়ির ভাঁজে লুকিয়ে থাকা তিন কোণা বীজের শুঁটি। চারদিকে আরো কত ফুলের বাহার। ফ্রোয়েবেল লিখেছেন "এই ফোটা ফুলগুলি বড় যত্নে, বড়ই আদরে ফুটে আছে। এদের বৈচিত্র্য আমায় বিস্মিত করে।" জন্ম শিক্ষক ছিলেন না ফ্রোয়েবেল। কিন্তু ঘুর পথে শিক্ষকতাই তাঁর জীবিকা, তাঁর জীবনচর্চা হয়ে দাঁড়ায়।

গোলক আকার। অদ্ভুত তার প্রকৃতি। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সহাবস্থানের প্রতিভূ গোলক। এক থেকে বহুর উৎপত্তি আবার এক-এর মধ্যে বহুর লীন হয়ে থাকা। এই বিশ্ব জগতের সব কিছুর মধ্যে বাস করে এক সৃজন সহ শক্তি, যা ধ্রুব, সর্বজনীন, প্রাণময়। এই মৌলিক ধর্মটিকে ফ্রোয়েবেল গোলক বা বলয় ধর্ম বলেছেন। এ জগতের প্রতিটি জীব ও জড় বস্তু এই প্রকটিত করে, সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর একই সঙ্গে ঘটে বাইরের বস্তু-জগতের নিয়ম-ধর্ম –প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে গুটিয়ে আনা। বাহিরকে অন্তরে আনা, অন্তরকে বাইরে প্রকাশ করার এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্য খোঁজাই মানুষের লক্ষ্য। শিক্ষা আর শেখানোর সাহায্য নিয়ে এই অন্তর-বাইরের মেলবন্ধন সম্ভব হয়। শিক্ষার আলোর সাহায্যে বাইরের বাস্তব জগতের খোল-নলচে ঠাহর করা সম্ভব হয়। শিক্ষাকে ভিত্তি করে মানুষের চেতনার সঙ্গে, মনের সঙ্গে বস্তু জগতের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। আর এই সম্পর্ক তৈরিতে খেলা, খেলনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খেলনা নিয়ে খেলতে খেলতে শিশু নিজেকে আর খেলনাটাকে চিনতে শেখে, আবিষ্কার করতে শেখে, দুজনে একত্রিত হয়। এই ভাবে পড়ুয়া আর পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেও ঘটে চেনা-পরিচয়-একত্রীকরণ।

১৮১৭ সালে Keilhau শহরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "সাধারণ জার্মান শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান" নামে একটা স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি প্রকাশ করেন বেশ কয়েকটি পুস্তিকা। এগুলিতে তাঁর শিক্ষা চিন্তা প্রকাশ পায়। এই স্কুল ব্যবস্থায় শিশু বেড়ে উঠবে তার পরিবারকে কেন্দ্র করে। পারিবারিক পরিবেশে পড়াশোনা করবে। স্কুল আর পরিবারের মধ্যে পারস্পারিক দেওয়া নেওয়া, বিশ্বাস, ভরসার বাতাবরণে ছোট-বড় সবাই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শিখবে এই ছিল ফ্রোয়েবেলের আশা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে চলত খেলা-ধূলা, সংলগ্ন খামারে কাজ করা। খামারে ফসল থেকে স্কুল আর পরিবারগুলির চাহিদা মিটত। শিক্ষা মানে কেবল মাত্র শিক্ষকের মুখ নিঃসৃত বাণী নয়। হাত কলমে কাজ, শিক্ষামূলক খেলা, কায়িক শ্রমের মাধ্যমে লেখা পড়া চলত। সতীর্থরাও ক্লাস নিত। দলে কাজ করে শেখা চলত। সমগ্র পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত থাকত। শেখা-পড়ার অর্থ কেবল বুদ্ধিতে শান দেওয়া নয়। একই সঙ্গে শরীর ও মনের গঠন। সামাজিক – আধ্যাত্মিক ভাবনার বিকাশ Keilhau এর শিক্ষাক্রম ছিল ফ্রোয়েবেল প্রণীত বলয় বা Spherical শিক্ষা তত্ত্বের পরম রূপায়ণ। ফ্রোয়েবেল তাঁর

শিক্ষা দর্শনের কথা লিখে গেছেন তাঁর লেখা "মানুষের জন্য শিক্ষা" (১৮২৬ এ প্রকাশিত) নামক বই-এ। এটি কেবল ফ্রোয়েবেলের দর্শন নয়, আদতে এটি তাঁর স্কুল শিক্ষা পদ্ধতি/ পেডাগজি। ভাষা শিক্ষা ফ্রোয়েবেলের কাছে আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। ভাষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে। ভাষা শিক্ষার ফলে মানুষ তার নিজস্বতা খুঁজে পায়। অঙ্ককে, ফ্রোয়েবেল কেবল মাত্র বিশেষ কিছু সমস্যা সমাধানের উপায় মনে করতেন না। ওনার মতে অঙ্কের সাহায্যে মানুষ, সামগ্রিক ভাবে বাস্তব জগতকে বিশ্লেষণ করতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে। Keilhau এর মুক্ত-মনা শিক্ষা ব্যবস্থা তদানীন্তন শাসকদের বিষ নজরে পড়ে। যদিও তদন্ত রিপোর্টে নেতিবাচক কথা বলা না থাকলেও পড়ুয়ার অভাবে ১৮৩১ নাগাদ তা বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে Helbe তে ফ্রোয়েবেল "জন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" নামে সংস্থা খোলেন, যেখানে ৩-৭ বছর বয়সী অনাথ শিশুদের আশ্রয়, কাজ ও সামুহিক শিক্ষার কথা ভাবা হয়। Kindergarten বা খেলাঘর প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত হন ফ্রোয়েবেল, আর এর জন্য নিজের দেশ জার্মানি ছেড়ে সুইটজারল্যান্ডেও যান। Helbe Project অনুসারে তৈরি করেন স্কুল। স্কুলে হবে পড়া-শোনা আর দুপুরে হবে হাতের কাজ ও খেত খামারের কাজ। এখানে এসে শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাথে জড়িত হন। Burgdorf শহরে অনাথ আশ্রমের পাশাপাশি চলবে গরীবদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আর জনসাধারণের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ এক সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে সৃজনাত্মক কাজ গুরুত্ব পাবে, তত্ত্বের সঙ্গে জীবন চর্চা যুক্ত হবে, লেখাপড়ার সঙ্গে চলবে হাতে কলমে কাজ করা। ফ্রোয়েবেল তাঁর পরিকল্পনা রূপান্তরিত হতে দেখেননি। জার্মানি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ততদিনে ফ্রোয়েবেল পৌঁছে গেছেন তাঁর জীবনের শেষ অংকে। স্কুল শিক্ষা থেকে তাঁর চোখ সরে এসেছে পরিবারে। তৈরি করতে হবে এমন একটি সামাজিক সংগঠন যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের নাগালে থাকবে না। "আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি, এতে রাম-রাবণ আছে, দেখে যাও নিজের চোখে হনুমান কেমন নাচে, পুতুল নেবে গো পুতুল"। ক্লাস ঘরে ঢুকে পড়ল খেলনা। খেলার সরঞ্জাম তৈরি করা শুরু করলেন ফ্রোয়েবেল। খেলা আর খেলনার সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবেশে উন্নতি ঘটাবেন। পরিবার কাঠামোতে বদল আনবেন। অভিভাবকদের সংগঠন তৈরি করতে উৎসাহ দিলেন। শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে পরিবার। অভিভাবকেরাও খেলা আর খেলনায় মেতে উঠবেন। প্রাক শৈশব অবস্থা থেকেই শুরু হবে বলয় বা Spherical শিক্ষা। এই প্রকল্প পরে Kindergarten এ পরিণত হয়। Kindergarten/ খেলাঘর এর জন্য সৃষ্টি হয় এক নতুন বৃত্তি– Kindergarten নার্স বা ধাই যারা খেলারত শিশুদের খেয়াল রাখবে, যত্ন নেবে। পরিবারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে খেলাঘর চলে এলো বাইরে। শিশুদের খেলনা সরবরাহের জন্য তৈরি করলেন একটা খেলনা কারখানা। ১৮৪৪ এ তৈরি করলেন এমন একটি

Kindergarten যেটা এক যোগে খেলাঘর ও খেলাঘরের ধাই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। ১৮৪৮ এ জার্মানি জুড়ে শুরু হলো মার্চ অভ্যুত্থান। রাজনৈতিক বদল হয়ত তার শিক্ষা উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে এমনটাই আশা করে ছিলেন ফ্রোয়েবেল। আলোচনা সভাও আয়োজন করে ছিলেন, যেখানে এসে দেশের শিক্ষাবিদরা জানাবেন Kindergarten যাতে স্থায়ী মান্যতা পায় সে নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনাও হয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লবটি অসফল হয় আর ফ্রোয়েবেলের স্বপ্নও সত্য হয় না। মুক্ত চিন্তার মানুষদের সঙ্গে ফ্রোয়েবেলের মেলামেশা, তাঁর মুক্ত ধর্মীয় ফ্রোয়েবেলে ভাবনা প্রাসিয়ান সরকারের না-পছন্দ হয়। ১৮৫২ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা সব খেলাঘরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

১-২ বছর বাচ্চাদের কথা ভেবে গেছিলেন ফ্রোয়েবেল, যাদের খেলাঘরের চৌকাঠ পেরোতে দেরি আছে। মায়েদের জন্য লিখে গেছেন একটা বই। বই এ আছে দৈনন্দিন জীবনের কত কথা। ছবিতে লেখা। মা তার হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে খেলা দেখাবে আর তাই দেখে নকল করবে। খেলার মাধ্যমে মা তার ভালোবাসা – আদর ছড়িয়ে দেবে। এই আদান প্রদানের ফলে শিশু ধীরে ধীরে তার পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠবে।

১৮৫২ সালে ফ্রোয়েবেল মারা যান। উনি মারা যাবার পরেও জার্মানি জুড়ে খেলাঘরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। কিন্তু ফ্রোয়েবেলের শেষ জীবনে প্রিয় এক বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টার ফলে Kindergarten এর কথা সারা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে উত্তর আমেরিকা থেকে জাপানে, তারপর সারা বিশ্বে। তার একমাত্র কারণ ফ্রোয়েবেলের নব্য-মানবতা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মানুষের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। রাষ্ট্রের জন্য এক টেকসই নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে, ব্যক্তি মানুষের প্রশিক্ষণ এর লক্ষ্য নয়।

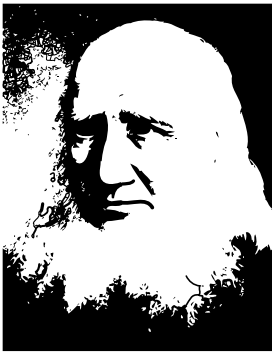

(১৭৮৩-১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ)

নিকোলাই ফ্রিদরিক সেভেরিন গ্রুনউইগ

ম্যাক্স লসন – এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ডেনমার্কের একটি ছোট্ট গ্রাম। সেই গ্রামের গির্জার ধর্মযাজকমহাশয় আর পাঁচজনের থেকে অনেকটাই আলাদা। গির্জা সংলগ্ন তাঁর যে বাড়ি, সেই বাড়ির পড়ার ঘর থেকে তিনি প্রায় বের হন না। রাত দিন লিখতে থাকেন। কেবল উপাসনার সময় গির্জার প্রার্থনা ঘরে দর্শনারথিদের সামনে আসেন, এটুকুই যা। আর সে কি সব যুক্তিপূর্ণ, তার্কিক লেখা। লেখা গুলো ঝড় তুলত ধর্মীয় মহলে। খস্‌খসে রুক্ষ মেজাজের গ্রুনউইগ ছিলেন "দৈত্য কূলের প্রহ্লাদের" মতো। যাজক হলেও তাঁকে প্রচারকের দায়িত্ব দেওয়া হতো না, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিচালনার ভার পেতেন না। তার একমাত্র কারণ তাঁর "সৃষ্টি ছাড়া" ভাবনা-চিন্তা, ক্ষুরধার লেখনী। যা তখনকার ধার্মিক, রক্ষণশীল চিন্তাধারার বিপরীতে বইত। ওদের কাছে বড়ই অপ্রিয় ছিলেন তিনি। নিকোলাই এফ এস গ্রুনউইগ– ধর্মযাজক হয়েও তার কাজের বিস্তার ছিল নানা দিকে। ছিলেন শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, লেখক, কবি। বরং ছিলেন না ঈশ্বরতাত্ত্বিক। ধর্মযাজক বাবার ধার্মিক প্রভাব ছাপিয়ে নিকোলাইয়ের মনে বড় বেশি করে ছাপ ফেলেছিলো নর্ডিক পুরান কাহিনীগুলো, স্ক্যান্ডেনেভিয়ান লোক গল্প, চারণ কবিদের গান, বীরগাথা নিকোলাইকে টানত। নিজেও লিখেছেন প্রচুর স্তব–স্তোত্র–গান।

ছোট্ট নিকোলাই-এর ছেলেবেলা ঘিরে ছিল এক কথা-বলার জগৎ। একদিকে গল্প, আর কথামালা ওল্ড নর্স-এর লেখা পুরাণ কাহিনী, বীর গাথা আর অন্য দিকে ধর্ম প্রাণ , রক্ষণশীল বাবার ধর্মীয় উপদেশ। বড় হয়ে নিকোলাই সেই ছোট বেলায় শোনা ওল্ড নর্স মিথগুলি অনুবাদ করতে শুরু করেন। আর এত মনোগ্রাহী হয় সেই অনুবাদ যে তার জোরে রাজ আনুকূল্যের বরাত জুটে যায়। রাজার অনুদানে তিনি ইংল্যাণ্ড যান। দেখে আসেন ১৯ শতকের শিক্ষার পীঠস্থান– ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা। সেটা ছিল ১৮১২। এদিকে এলো ১৮৩০ সাল। গোটা ডেনমার্ক জুড়ে তখন পরিবর্তনের ঢেউ। রাজা সপ্তম চার্লস এর হাত ধরে গণতন্ত্র পা রাখছে ড্যানিশ রাজনীতির অলিন্দে। রাজা তৈরি করছেন মন্ত্রণা সভা যেখানে আপামর জন সাধারণ মতামত দেওয়ার জন্য-শোনার জন্য যোগ দিচ্ছেন। এর আগে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে আইন পাশ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে গ্রুনউইগের কাছে মন্ত্রণা সংসদে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অধিকারটি তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ওনার মনে হয়েছিল গোটা ব্যাপারটাই

অ-সার, মুখের কথা। পরে তিনিও বুঝতে পারেন যে সত্যি সত্যিই সমাজের নিচু স্তরের কথা শোনা হচ্ছে এই সংসদ গুলিতে। এটা বুঝে তার শিক্ষা সংক্রান্ত লেখা-পত্র যেন বেড়ে গেল। "মানুষের কণ্ঠস্বর" তৈরি করতে হবে। এর জন্য চাই শিক্ষা। বস্তা-পচা লাতিন ভাষায় শিক্ষা নয়। চাই ডেনমার্কের মাতৃভাষায় শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রাধান্য পাবে বচন– কথা বলা। যুগ যুগ ধরে যে কথা বলা – গল্প বলার ঐতিহ্য বয়ে চলেছে এ দেশ জুড়ে– সেই মৌলিক যোগাযোগের ভাষা -প্রাণভোমরা হয় এই শিক্ষা পাঠক্রমের। আর পাঠক্রমের আসল কুশীলবরা হবেন এক দিকে ড্যানিস চারণ কবিরা, আর অন্যদিকে পড়ুয়ারা হবেন সমাজের নানা স্তর থেকে, নানা বৃত্তি থেকে উঠে আসা নানা বয়সের সাধারণ মানুষ। গ্রুনউইগ-এর মতে এই স্কুলের আসল শিক্ষক হবেন চারণ কবি তা কেন ? তাঁর মতে চারণ কবিরা সাধারণ মানুষের আসল শিক্ষক। কারণ "তাদের গলার স্বরেই মিশে থাকে পিতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা জাগানোর, লালন পালনের ক্ষমতা, তাদের ভাষায় মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা আরো শক্তিমান হয়ে ওঠে, ধনী হয়ে ওঠে। "এই ধরনের শিক্ষাক্রমে পুরাণকাহিনী বীর গাথা, ড্যানিশ ছড়া, কবিতা গুরুত্ব পাবে।

কেমন হবে এর উপযোগী বিদ্যালয়?

গ্রুনউইগ দাবি করলেন এক ফোক-হাই-স্কুল বা লোক-বিদ্যালয় তৈরি করার জন্য। কেমন সে স্কুল? গ্রুনউইগ লিখলেন কখনই সেই স্কুল লাতিন– গ্রামার স্কুল নয়। ওগুলো যেন এক একটা "মৃত্যুপুরী"। গ্রুনউইগ দাবি করলেন "জীবনের জন্য স্কুল" বা "ফোক-হাই-স্কুল"। যেখানে ঘটবে প্রানের সঙ্গে প্রানের আদান–প্রদান, জীবনের সঙ্গে জীবনের মেল বন্ধন। শিক্ষক আর পড়ুয়ারা হবে একে অপরের সাথী, সহচর। আবাসিক হবে এই স্কুল। এই স্কুলে যা পড়ানো হবে তার সঙ্গে থাকবে জীবনের যোগ। নিজেদের চেনা জানা জগতকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে শিক্ষক আর পড়ুয়ারা ক্লাস ঘরে হবে আদান-প্রদান। আরো জানা-শেখা-বোঝা। তারপর পড়া শেষ করে এক এক করে যখন তারা ফিরে যাব নিজেদের চেনা পরিবেশে, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে অর্জিত জ্ঞান। ব্যক্তি মানুষটি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ-সংসার বিকশিত হবে। এ যেন লাতিন-গ্রামার স্কুল ধারার একদম বিপরীত ধারা। এখানে থাকবে না বইপত্রের সমাবেশ, না থাকবে পরীক্ষা ব্যবস্থা। এই স্কুল বাস্তবে রূপ দেবে যীশু খৃষ্টের "Living Word" বা "জীয়ন্ত শব্দ" কে।

অন্তিম ভোজনে বসেছেন যীশু, সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ১২ জন শিষ্য, যাঁরা এসেছেন সমাজের নানান স্তর থেকে। যীশু আর শিষ্যরা– শিক্ষক আর তাঁর ছাত্রদল। রুটি খেতে খেতে আর সুরা পান করতে করতে চলছে কথা। "জীয়ন্ত শব্দ" "Living Word"-Phrase টি যীশু ব্যবহার করেছিলেন সেদিন। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি নিঃশব্দ ছিল না। এখানে কথা বলা হচ্ছিল। যীশু বলছেন চির সত্যের কথা। বাকিরা শুনছেন – সাড়া

দিচ্ছেন। যীশুর কথাগুলো মৃত শব্দ ছিল না। এদের মধ্যে প্রাণ ছিল– যীশুর প্রাণ মিশেছিল। শক্তিমান শব্দ, সক্ষমতার শব্দ যীশুর মুখ থেকে ঝরে পড়ছিল আর সেই শব্দগুলো শিষ্য– শ্রোতাদের মনে সক্রিয় সাড়া জাগাচ্ছিল। ধর্মযাজক গ্রুনউইগ Last Supper- এর এই ঝরে পড়া দেখতে পেয়েছিলেন, তার স্বপ্নের লোক বিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরে। যা ক্লাস কক্ষ ছাড়িয়ে বাইরের বৃহত্তর জগতের ছড়িয়ে পড়বে– ফোক হাই স্কুলের পড়ুয়াদের মাধ্যমে। গ্রুনইউগের ফোক হাইস্কুল সংক্রান্ত ধারণা প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৩২ সালে। তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন নর্ডিক পুরাণচর্চায়। তিনি লিখলেন "নর্ডিক মিথলজি (নর্ডেনস্ মাইথোলজি)" নামক বইটি। আর এই বইয়ের ভুমিকায় প্রথম দেখা যায় ভবিষ্যতে লোক-বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান ধারণা। গ্রুনউইগ ফোক হাই স্কুলের প্রবক্তা হলেও তিনি এই স্কুল স্থাপন করেননি। জীবনের মধ্য ভাগে তিনি ভারটোভ গির্জার বিশপ নিযুক্ত হন। আর এই গির্জার পড়ার ঘর থেকে লোক-স্কুলের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ১৮৪৪ – এ প্রথম ফোক স্কুলটি রডিং– এ তৈরি হয়। গ্রুনউইগের সুযোগ্য শিষ্য ক্রীস্টেন কোল্ড নিজের স্কুলটি স্থাপন করে লোক-স্কুল আন্দোলনের সূচনা করেন। গ্রুনউইগ কিন্তু তার পড়ার ঘর আর লেখার টেবিলের চৌহদ্দি ছেড়ে বেরোতেন না। একমাত্র গির্জার অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যেত। অদ্ভূত ব্যাপার তাঁর চিন্তাধারায় তৈরি হওয়া স্কুলগুলিকেও দেখতে যেতেন না। কোল্ডই আসতেন তাঁর কাছে মুশকিল আসানের পথ খুঁজতে। ১৮৬৪ সাল ইতিমধ্যে সারা ডেনমার্ক জুড়ে তৈরি হয়ে গেছে ১৫ টি ফোক হাইস্কুল। ডেনমার্ক জড়িয়ে পড়ল যুদ্ধে আর প্রুশিয়ান-অস্ট্রিয়ান সৈন্যদলের কাছে হেরে গেল ডেনমার্ক। এরপর হল জামার্নির সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেও ডেনমার্ক পরাজিত হল। ডেনমার্কের প্রথম ফোক হাই স্কুল ছিল রডিং- এ। সেই রডিং চলে গেল জামার্নির দখলে। পরাজিত ডেনমার্কের একদম উত্তর সীমান্তে অ্যাসকভে। যেহেতু জার্মান সীমানার কাছে, তাই অ্যাসকভে স্কুলটিতে ড্যানিশ সংস্কৃতি চর্চার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল।

অ্যাসকভের স্কুলটিকে সামনে রেখে এরকম আরো স্কুল তৈরি হল সারা ডেনমার্ক জুড়ে। ফোক হাই স্কুলের সেটা ছিল স্বর্ণযুগ। ফোক হাইস্কুলের মাধ্যমে পড়ুয়ারা জানবে তার "পিতৃভূমির কথা, দেশের মানুষের কথা, মাতৃভাষার কথা, দেশের রাজার কথা"– এই ছিল গ্রুনউইগের বাসনা। তিনি বলেছেন এমন এক লোক জীবনের কথা যা আর সবাইকে কাছে টেনে নেয়। এই লোক জীবন চর্চা করার অর্থ দেশের মানুষের পরিচিতির স্বীকৃতি দেওয়া, সংরক্ষণ করা দেশের মানুষের সাহিত্য, কবিতা ও জীবনচর্চাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আপাত ভাবে উগ্র-জাতীয়তাবাদী মনে হলেও, গ্রুনউইগের লেখা ভালো করে বুঝে দেখলে দেখা যাবে যে তিনি আদতে ছিলেন একজন বিশ্ববাসী ও জীবনবাদী মানুষ। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাঁর প্রবর্তিত ফোক হাইস্কুল উৎখাত হওয়া মানুষজনের মনে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম

হয়েছিল। ফোক হাইস্কুলের আন্তরিক, অত্যন্ত আপন, চেনা-জানা পাঠক্রম বহু বহু সাধারণ খেত খামারের খাটা ড্যানিশ চাষিকে স্কুল শেষ করে নিজেদের জানাশোনাকে আরো বিকশিত করে নিজেদের জীবিকায় ফিরে যেতে সাহায্য করে ছিল। শিক্ষিত হয়েও তাঁরা তাঁদের জীবিকাচ্যুত হননি। গ্রাম ও কৃষি-ভিত্তিক জীবিকা ও অর্থনীতিকে এই স্কুল আন্দোলন আরো উজ্জীবিত করেছিল। সময়ের সঙ্গে ড্যানিশ সমাজে পরিবর্ত্তন এসেছে। কৃষি থেকে ক্রমে এ দেশ শিল্প নির্ভর হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে ফোক হাইস্কুলগুলিও তাদের চরিত্র বদলেছে। ভাবা হয়েছিল গ্রুনউইগের ফোক স্কুল হয়তো ২০ শতকের আলো দেখবে না। শত্রুর আশায় ছাই দিয়ে ডেনমার্ক জুড়ে ফোক হাই স্কুল আরো আরো তৈরি হয়েছে। সেটা ১৯৮০ সালেও। সাম্প্রতিক কালেও এর প্রসার দেখা যায়। পাশাপাশি সুইডেন, নরওয়ে, ফিন-ল্যাণ্ড ও জার্মানি, পোল্যাণ্ডেও ফোক স্কুলের ঢেউ গিয়ে পড়ছে।

গ্রুনউইগ চেয়ে ছিলেন স্বল্প মেয়াদের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে "মৃত জ্ঞানকে" প্রতিস্থাপিত করবে জীবন। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সরিয়ে জায়গা করে নেবে জীবনমুখী "অন্য আর এক রকম ব্যবস্থা। "এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে – ভবিষ্যতের দিকে।

(১৮২০-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ)

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

অ্যালেক্স অ্যাটেওয়েল – এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

যদি প্রশ্ন করা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? কেন আমরা পড়াশোনা করব? ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনটাই যেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যাওয়া। কেবল তত্ত্ব কথা নয়, সেই তত্ত্বের বাস্তবে রূপায়ণ ও চর্চ্চা করাই ছিল তাঁর জীবন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতে শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে শেখায় না, কাজ করতে শেখায়।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য। হাসপাতালের লম্বা অলিন্দ। দুই ধারে সারে সারে রুগীর শয্যা পাতা। শয্যায় শায়িত অসুস্থ, আতুড় মানুষ। রাতের অন্ধকারে সেই অলিন্দ ধরে শান্ত অথচ দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছেন একজন সিস্টার। পরনে নার্সের পোশাক। হাতে দীপের আলো। ১৮৫৪ সাল। লন্ডনের এক হাসপাতালে রোজ এই দৃশ্যটি দেখা যেত। ক্রেমিয়ান যুদ্ধ ফেরৎ বহু আহত সৈনিকের শরীরে, মনে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প"। এই আলোর পথ-যাত্রী আজীবন খোঁজ করে গেছেন, চর্চ্চা করে গেছেন সেই শিক্ষার যা বুদ্ধিবৃত্তির চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে আসবে। খোঁজ করেছেন এমন এক শিক্ষার যা কাজ করবে, যাকে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা যাবে।

সমগ্র নারী জাতির আর্ত্তিকে নিজের মুখের ভাষায় ফ্লোরেন্স প্রকাশ করেছেন এই বলে "মেয়েরা অপেক্ষা করে আছে সেই শিক্ষার জন্য যা তাদের (অন্যকে) শেখাতে সাহায্য করবে। সেই শিক্ষা এমন হবে যার মধ্যে ধরা দেবে মানব মনের চলন। সেই শিক্ষা খোঁজ দেবে মানবজীবনের নিয়মরীতির। আর সেই নিয়মরীতি কী উপায়ে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যাবে, শিক্ষা তার হদিসও দেবে"।

বাবার কাছে লাতিন, গ্রিক, ইতিহাস, দর্শন, অঙ্ক, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার পর ফ্লোরেন্স চাইলেন তাঁর অর্জিত শিক্ষার যর্থাথ ব্যবহার করতে। চাইলেন অনাথ, দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াতে। চেয়েছিলেন সালিসবারির আতুড় আশ্রমে নার্সের কাজ করতে। চেয়েছিলেন জীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে শিক্ষার আলো নিয়ে মানুষের জীবনে কাজে লাগতে।

১৯শ শতকের ইংল্যান্ড। নারীর স্বাধীন চেতনার বিকাশের কথা ভাবাই যেত না। পরিবার তাঁর ইচ্ছার অন্তরায় হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত নিশ্চিন্ত জীবনের আগল ফ্লোরেন্সের

মনের বাসনা পূরণ করতে দিল না। ফ্লোরেন্স না-ছোড়। পারিবারিক বাধা অস্বীকার করে নার্সিং ট্রেনিং নিতে শুরু করেন।

ফ্লোরেন্সের যখন ২৯ বছর বয়স তখন তিনি ইজিপ্ট, গ্রীস ঘুরতে বেরোলেন। ফেরার পথে পড়ল জার্মানি। ভাসেলডর্ফের কাছে কেইসওয়ার্থের একটি প্রতিষ্ঠান দেখলেন। একাধারে হাসপাতাল, অনাথাশ্রম আর স্কুল। ওই প্রতিষ্ঠান ফ্লোরেন্সের জীবনে আনল একটা বাঁক। পরের বছর ফ্লোরেন্স গেলেন এখানে নার্সিং শিখতে। আর এর পরই তো তৈরি হলো ইতিহাস। কেইসওয়ার্থ থেকে ট্রেনিং নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরলেন ফ্লোরেন্স। নার্সিং বা ধাত্রীবিদ্যা নিয়ে তাঁর ভাবনা আর কাজ শুরু হলো। নার্সিং শিক্ষাকে এক সংগঠিত রূপ দিতে চান। তত্ত্ব আর চর্চ্চার মেলবন্ধন। হাসপাতাল পরিচালনাও যে একটা শিক্ষার বিষয় হয়ে উঠতে পারে তা দেখিয়ে দিলেন ফ্লোরেন্স। তাঁর শিক্ষার পাঠক্রমের বিষয় উঠে আসত হাসপাতালে কাজ করতে করতে। তাই নার্সিং ট্রেনিং- এর পাঠক্রমে হাসপাতাল পরিচালনা, হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যবিধি ঢুকে পড়ল। অপরিচ্ছন্নতা যে রোগের কারণ, হাসপাতালে রুগী মৃত্যুর কারণ সেটা তিনি জোর দিয়ে বিশ্বাস করতেন।

নার্সিংশাস্ত্রে চিকিৎসা ছাড়াও হাসপাতাল ওয়ার্ডের পরিস্থিতি, বিছানাপত্র, রোগীর পোষাক, রোগীর আহার- প্রভৃতি বিষয়গুলোর চর্চ্চা হতে লাগল। সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের জন্য আমোদ-প্রমোদ, বই পড়ার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ভাবা হতে লাগল। ধীরে ধীরে তাঁর যুগান্তকারী ভাবনা চিন্তা ডাক্তারি শাস্ত্রে প্রবেশ করল। ইংল্যান্ড তখন যুদ্ধরত। ডাক্তাররা ওয়ার্ডে আহত সৈনিকদের দেখতে এসে যেন প্যাথোলজি ও অন্যান্য বিষয়ে ট্রেনিং পান সে ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন ফ্লোরেন্স। পরিসংখ্যানবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ফ্লোরেন্স তাঁর তত্ত্ব তৈরি করতেন। মিলিটারিতে, সৈন্যদলে ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা শুরু হয় ফ্লোরেন্সের যুক্তিতে। শুধু ডাক্তারদের শিক্ষা নয়, সৈন্যদলের শিক্ষার কথাও ভেবেছিলেন ফ্লোরেন্স। সৈন্য ব্যারাকে বই আর খেলার সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। যাতে অবসর সময়ে সৈনিকেরা অর্থপূর্ণ ভাবে সময় কাটাতে পারেন। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে মদ্য পান আর জুয়া খেলা বন্ধ করা সম্ভব হবে। এমনটাই মনে করেছেন ফ্লোরেন্স।

বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ড জুড়ে যে নার্সিং বৃত্তির প্রচলন ছিল, তার পিছনে কাজ করত ধর্ম আর ধার্মিকতা। ধীরে ধীরে ধর্মের প্রভাব থেকে নার্সিং বৃত্তি বেরিয়ে আসছিল। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ধর্ম নিরপেক্ষ ধাত্রী প্রশিক্ষণের জন্য কাজ শুরু করেন। তাছাড়াও সমাজে নার্সিংয়ের কাজকে খুব উচুঁ নজরে দেখা হতো না। ফ্লোরেন্স ১৮৫৯ সালে নিজের অর্থ দিয়ে নার্সিং ট্রেনিং স্কুল খুললেন। নাইটিঙ্গেল স্কুলে প্রথম যা যা ঘটল তা হলো:- শিক্ষানবিশি নার্সের ধারণা তৈরি হলো। যাঁরা স্টাইপেন্ড পাবেন। নার্সিং স্কুলটি নার্সিং শিক্ষার জন্য তৈরি হলেও একটা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকল

যেখানে হাতে কলমে কাজ করবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নার্সরা। শিক্ষানবিশিরা আবাসিক ছিলেন। নাইটিঙ্গেল স্কুলের শিক্ষা ধারা ছড়িয়ে পড়ল দেশের অন্যান্য জায়গায়। নাইটিঙ্গেল স্কুল থেকে প্রশিক্ষপ্রাপ্ত নার্সরা ছড়িয়ে পড়লেন নানান হাসপাতালে।

ফ্লোরেন্স মনে করতেন প্রথাগত ট্রেনিং একজন নার্সকে শিক্ষা দেয় কীভাবে কাজ শিখতে হয়। তারপর সারা জীবন ধরে কাজ করতে করতে শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলে। ফ্লোরেন্সের কাছে নার্সিং কেবলমাত্র একটা বৃত্তি বা পেশা ছিল না। নার্সিং আরো বড় কিছু। নার্সিং বা সেবা তাঁর কাছে ছিল ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মতো মহৎ একটি কাজ। রুগীর সেবার মধ্য দিয়ে মানবতার মঙ্গল সাধন ঘটে। এটাই ছিল ফ্লোরেন্সের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। ফ্লোরেন্স তাঁর জীবনের নানাক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছেন। বাড়ির কাছে একটি ছোট প্রাথমিক স্কুল ছিল। সেই স্কুলের লাইব্রেরি তৈরি করে দেন তিনি। পাঠ্যবই থেকে শিক্ষা নয় পড়তে হবে আরো অন্য বই। তবেই হবে শিক্ষা অর্জন। আবার শুধু বই নয়, নিত্য ব্যবহার্য উপকরণ– মাটি, পাথরও শিক্ষণ সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে। ফ্লোরেন্স তেমনই ভাবতেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ফ্লোরেন্স ভেবেছেন, কাজ করেছেন। পরিসংখ্যানবিদ ফ্লোরেন্স তাঁর তথ্য অন্বেষণের কাজ করেছেন অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সাউথ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কার মতো ব্রিটিশ কলোনি গুলিতে। ওই দেশগুলোর ১৪৩টা স্কুলের পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সমীক্ষা করেন। এই সব দেশের সাধারণদের জন্য ইউরোপীয় শিক্ষা যে উপযুক্ত নয়, এমন জোরালো মতামত জানান ফ্লোরেন্স।

মধ্য ১৯শ শতকে ইংল্যান্ডে ওয়ার্কহাউস বা শ্রমবাড়ির চল ছিল। এখানে কাজ করত সমাজের গরীব মানুষেরা। এই সব ওয়ার্কহাউসে শিক্ষার প্রচলনের কথাও বলেন ফ্লোরেন্স। যাতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা দরিদ্র মানুষ নিজেদের জীবনের দায়িত্ব নিতে শেখে।

পরিসংখ্যানবিদ্যার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন ফ্লোরেন্স। সামাজিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছিলেন। ভারতবর্ষ আলাদাভাবে ফ্লোরেন্সের কাছে ঋণী। ১৮৫৭ সাল। ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ সৈন্যব্যবস্থার স্বাস্থ্যবিধি বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমগ্র ভারতের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তাঁর নজরে আসে। এই বিষয়ে তাঁর মতামত, লেখালেখি তদানীন্তন ভারত সরকারকে বাধ্য করে ভারতের জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ নিয়োগ করতে। ভারতের গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থা, ভারতের দূর্ভিক্ষের কারণ। সেচব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তাঁর অমূল্য ভাবনা চিন্তা এই দেশকে উপকৃত করেছে। শিক্ষা যে চর্চ্চা করার বিষয় তা নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

(১৮২৮-১৯১০ খ্রিস্টাব্দ)

লিও তলস্তয়

সিমিয়ন ফ্লিপোভিচ ইয়েগোরভ – এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ছোট্ট একটা স্কুল। ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সী বাচ্চারা পড়তে আসে। গ্রামের স্কুল, পড়তে আসে চাষী বাড়ির ছেলেমেয়েরা। সকাল নটার মধ্যে স্কুল বসে। পড়াশোনার পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া আর কিছুক্ষণের বিশ্রাম। তারপর আরো তিন-চার ঘণ্টা স্কুল। স্কুলে পড়ুয়াদের তিনটি বিভাগঃ- ছোট, মাঝারি, বড়। বাচ্চাদের বয়স, শেখার ক্ষমতা আর শেখার মাত্রা অনুসারে এই বিভাগ। ক্লাস ঘরে পড়াশোনা চলে আলাপ-আলোচনার সাহায্যে। বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গল্প বলেন মাষ্টার মশাই। কথালাপ আর গল্পের মধ্যে দিয়ে শেখা হয়ে যায় প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক আর ভাষা। এছাড়াও শেখানো হয় আঁকা আর গান। কি পড়ানো হবে তা স্থির হয় শিশুর ক্ষমতা বুঝে। এছাড়াও অভিভাবকের মতামত নেওয়া হয়। এই স্কুলের মূলনীতি হল পড়ুয়াদের সম্মান করা। দুষ্টুমি করলেও শাস্তি পায় না, পড়াশোনা বা ভালো ফল না করলেও তিরস্কার জোটে না। এই স্কুল বিশ্বাস করে যে ছোটরা শিখতে চায়। জোর করে শেখাতে হয় না। শিক্ষকের কাজ পড়ুয়াদের পরিস্থিতি আর ক্ষমতা সম্বন্ধে সজাগ থাকা। আর শেখানোর লক্ষ্যে চির সৃষ্টিশীল থাকা। মুক্ত পরিবেশ, স্বাধীন বাতাবরণে পড়া শেখা চলবে। যেহেতু পড়ুয়াদের জীবনে তাদের চারপাশের পরিবেশ জানা বোঝার নানান উপকরণ সাজিয়ে রাখে আর বাচ্চাদের খোলা মন সেগুলো গ্রহণ করে, তাই এই স্কুলে সেই জ্ঞান অর্জনের উপায়কেই স্বীকার করে। পরিবেশ থেকে জানা দেখা শোনা বিষয়গুলো শিশুরা স্কুল ঘরে বয়ে আনে। সেগুলোকে ঘিরে শিক্ষক-পড়ুয়াদের মধ্যে আলোচনা হয়। তৈরি হয় নতুন জানা-বোঝা-শেখা। পড়ুয়াদের মধ্যে তৈরি হয় স্বাধীন বোধ ।

এই স্কুলের শিক্ষাবোধ ছড়িয়ে গেছে নানান অঞ্চলে। তৈরি হয়েছে আরো বেশ কয়েকটি এই ধরণের স্কুল। স্কুল দেখতে এবং, কি উপায়ে এখানে পড়া-শেখা চলছে সেটা বুঝে নিতে বহু মানুষ আসেন। তাঁরা সবাই স্কুলটির দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। স্কুলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর এটা বেশ ভালো লাগে। যে সব ভাবনা-চিন্তা-বোধ নিয়ে তিনি স্কুলটি শুরু করেছেন, তার একটা যাচাই হয়ে যায় এই ধরণের আদান-প্রদানে।

১৮৫৯ সাল। রাশিয়ার টুলা রাজ্যের য়াসনায়া অঞ্চলে এমন একটি স্কুল গড়ে উঠেছিল। স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন লিও তলতস্তয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। বিশ্ব জোড়া

তাঁর ঔপন্যাসগুলির খ্যাতি।

স্কুলটা শুরু করে, বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন পড়ানো যে সে কাজ নয়। এর জন্য পড়াশোনা করার দরকার। বেরিয়ে পড়েন ইউরোপের দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা সরেজমিনে দেখে আসতে। প্রচুর নাম করা চিন্তাবিদ্, শিক্ষাবিদ্দের সঙ্গে তলস্তয় আলোচনা করেন, পড়াশোনা করেন। রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের কথা তাঁর মাথায় ঘোরে। শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার কথা ভাবেন। ভাবেন কী উপায়ে শিক্ষাকে পৌঁছে দেওয়া যাবে সমাজের নিচু তলার মানুষদের মধ্যে, প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে। রুশ সমাজের শ্রেণী বিভাজনটা সে সময়ে বেশ স্পষ্ট। একদিকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, সুবিধাভোগী ধনী মানুষের দল, আর অন্য দিকে সমাজের নিচু তলার কৃষক মজুরদের দল যারা অশিক্ষিত নিরক্ষর। সমাজকে ঘিরে আরো স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, হিংসা, কুসংস্কার আর অন্যায় অবিচার। তলস্তয় মনে করতেন শিক্ষাই একমাত্র হাতিয়ার, যার সাহায্যে সমতা আর শান্তি আনা যায়। তিনি মনে করতেন মানুষের আত্মিক উন্নতি আসবে শিক্ষারই হাত ধরে।

১৮৬১ সাল সারা রুশ জুড়ে পরিবর্তনের ঢেউ। চারদিকে শিল্প গড়ে উঠছে, ক্রীতদাস প্রথা সমাপ্ত কিন্তু নতুন এক দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রসার ঘটছে, কিন্তু সেখানেও বিশেষ এক শ্রেণী লাভের গুড় লুটে-পুটে নিচ্ছে। সেই সুবিধাভোগী ধনী শ্রেণীর তখন জয়জয়াকার। তলস্তয় একাধারে তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস লিখে চলছেন। সমাজের দ্বন্দ্ব, সমস্যা উঠে আসছে তাঁর লেখায়। আর অন্য দিকে জোরদার হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তা। শিক্ষা আর বিজ্ঞানকে সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান ভাবে পৌঁছে দিতে হবে। সমাজ যথার্থ ভাবে এগোবে যখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর শিক্ষার সুফল সমান ভাবে ভোগ করবে। এর জন্য চাই মুক্ত স্বাধীন শিক্ষা।

শৈশব থেকেই এই স্বাধীন শিক্ষার আস্বাদ গ্রহণ করবে মানুষ। মানব জীবন জুড়ে চলে বিকশিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। শিশুকাল, বাল্য-যৌবন পেরিয়ে হয় একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ। এই যাত্রাপথে শৈশবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মধ্যে নানান মানবিক গুণাবলী স্বাভাবিক ভাবে বিকাশ লাভ করে। তাই শিশু যখন শিখবে, সে সেই শেখার পরিবেশ এই স্বাধীন, স্বাভাবিক, স্বতোবৃত্ত বিকাশকে যেন কোন ভাবেই বাধা না দেওয়া হয়। শৈশবকালের শিক্ষা পদ্ধতি হওয়া উচিত শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষকের প্রভাব যেন শিশুর উপর সব চাইতে কম পড়ে। তলস্তয়ের শিক্ষা ভাবনায় যে শিক্ষা প্রণালীর কথা আসে তাতে শিশু বা শৈশব একটা পাঠ্য বিষয় হয়ে ওঠে। শিশুর জন্য শিক্ষা নিয়ে ভাবতে গেলে, ভাবতে হবে তার সামাজিক আর মানসিক অবস্থান নিয়ে। পাঠ্যপুস্তক নিয়েও তলস্তয়ের কাজ নজরে পড়ার মতো। তিনি তৈরি করেছিলেন প্রাথমিক পাঠের জন্য বই। এই প্রাইমারের গঠন, বিষয় আর পাঁচটি প্রাইমারের মতো

ছিল না। চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল প্রাইমারি বইটি। রাশিয়ার স্কুলগুলিতে তা ব্যবহার হতো।

প্রথম খন্ডটি অক্ষর পরিচয়ের জন্য হলেও সেটি ছিল বিশ্বকোষের মতো। ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রসায়নের মতো বিষয়গুলির মৌলিক ধারণা এতে স্থান পেয়েছিল। ১৮৭৫-এ তলস্তয় নতুন আরেকটি প্রাইমার লেখেন যেখানে স্থান পায় ছোট ছোট গল্প। অপূর্ব শিল্প সুষমায় ভরা ছিল সেই ছোটদের প্রাইমার।

তলস্তয় বিশ্বাস করতেন যে শিশু প্রাথমিক ভাবে ছবি, রঙ আর শব্দকে ব্যবহার করে, ভাবতে শেখে, চিন্তা করতে শেখে। ফলে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের দিন গুলিতে যুক্তির চাইতে ছবির মাহাত্ম্য অনেক বেশি। ধীরে ধীরে বয়স যত বাড়ে, শেখার বিষয়গুলি নিয়ে যুক্তি প্রবেশ করলেও ছবির গুরুত্ব রয়েই যায়। তলস্তয়ের শিক্ষা ভাবনা প্রকাশিত হতো তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত একটি শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকায়। এতে ছাপা হতঃ

ক) শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা
খ) স্কুল শিক্ষার বাইরে পড়া-শেখা চর্চার নানান উদ্ভাবন যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে বইয়ের প্রচার
গ) ব্যক্তিগত উদ্যোগ স্থাপিত নানান স্কুলের কথা
ঘ) শেখার পদ্ধতিতে নানান নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের কথা।

প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনার করা হত এই পত্রিকায়। শিশুদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা কীভাবে করা যাবে তাই নিয়ে লেখা বেরোত, চলতো আলোচনা। মোট কথা শিক্ষা বিজ্ঞানের চর্চার স্থল হয়ে ওঠে এই পত্রিকা। এই সব দেখে রুশ শাসকদের চোখে সন্দেহ জাগে। তলস্তয়ের কাজকে তাঁরা ধর্ম আর নীতি বিরোধী বলে সাব্যস্ত করেন। পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তলস্তয়ের পরিণত বয়সের শিক্ষা ভাবনা মানব সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে। সামাজিক কল্যাণে, মানুষে মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে লেখালেখি করেন। লেখক তলস্তয়ের অভিযান কিন্তু অব্যহত ছিল। তাঁর লেখার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কিন্তু আমরা অনেকেই জানতাম না, চিনতাম না শিক্ষাবিদ্ তলস্তয়কে। এই সেদিনও প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার লেখক শিল্পী গোষ্ঠী লিও তলস্তয়ের নামে পুরস্কার ঘোষণা করে আর পুরস্কৃতের তালিকায় সেইসব মানবতাকর্মীর দল স্থান পায় যাঁরা হৃদয় দিয়ে শিশুদের জন্য কাজ করেছেন। তাই আজও রুশ দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠক্রমে কাজ করছেন। তাই আজও রুশ দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠক্রমে তলস্তয়ের চিন্তা ভাবনা স্থান পায়।

(১৮৫৯-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ)

জন ডিউই

রর্বাট বি ওয়েস্টব্রুকের লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

"মনের মধ্য একটা ছবি বারবার ঘুরে ফিরে আসে। একটা স্কুলের ছবি। যেখানে চলছে এক বিশাল কর্মকান্ড। কাঠ চেরাইয়ের কাজ চলছে। হাতের কাছেই রয়েছে ছুতোর কাজের হরেক রকম সরঞ্জামঃ- হাতুড়ি, দা, মাপ-জোকের ফিতে। মডেল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। হাতে-কলমে এই কাজ করতে করতে পড়ুয়ারা একদিকে যেমন জেনে যাচ্ছে বাড়ি তৈরি করার বৈজ্ঞানিক কারিগরি কল-কাঠি। তেমনি জেনে যাচ্ছে বাড়ি তৈরির কাঁচা মালের জোগাড় করতে গিয়ে প্রকৃতির অবদানের কথা। নির্মাণ শিল্পের কলা-কৌশল জানতে গিয়ে শিল্পের সামজিক দিকটাও তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। চোখ আর হাতের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক অপরূপ সমন্বয়।"

জন ডিউক, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকের কাছে প্রস্তাব দেন একটা স্কুল গড়ার। দর্শনের পেডাগজি বা শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অংশ হবে এই স্কুল। দর্শনতত্ত্বের সরাসরি চর্চা হবে এই স্কুলে। তত্ত্ব আর অনুশীলন হাত ধরাধরি করে চলবে। ডিউই-র ক্রিয়ামূলক মনস্তত্ত্ব আর গনতন্ত্রিয় ন্যায় নীতির যে তত্ত্ব ছিল তার পরীক্ষাগার হবে এই স্কুল। সেটা ছিল ১৮৯৮ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারমশাইদের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলের পড়ুয়া। প্রথম দিকে পড়ুয়া সংখ্যা ১৬ জন, পর বেড়ে ১৪৯ হয়েছিল। "ডিউই স্কুল" নামে পরিচিত ছিল ছোট্ট এই স্কুল। পড়ুয়াদের ১১টি ভাগ। বয়স অনুসারে এই দল ভাগ। এক এক দলের এক এক পাঠক্রম। স্কুলের সবচেয়ে ছোটরা, ৪-৫ বছর যাদের বয়স তাদের পাঠক্রমে ছিল ঘর-গেরস্থালির কাজ যেমনঃ রান্না করা, সেলাই-ফোঁড়াই, ছুতোর মিস্ত্রির কাজকর্মগুলি হাতে-নাতে শেখা। ৬ বছর বয়সীরা শিখবে কাঠের খন্ড জুড়ে জুড়ে খামার বাড়ি তৈরি করা, স্কুলের বাগানে গম আর তোলোচাষ করা। আর শুধু চাষ করা নয় ফসল তুলে ঝাড়াই-পেসাই করে বাজারে গিয়ে সেই শস্যপণ্য বিক্রি করা। ৭ বছর বয়সীরা নিজেদের বানানো গুহায়। বসে প্রাগোইতিহাসিক জীবন ধারার বোঝার চেষ্টা করত আর ৮ বছরের খুদের দল ৭ সাগর জয় করা অভিযাত্রী আর দুঃসাহসিকদের জীবন নিয়ে পড়াশোনা করত। ৯ বছর বয়সীদের দল নিজেদের স্থানীয় ইতিহাস আর ভূগোল নিয়ে চর্চা করত ১০ বছরের একটু বড়রা জেনে নিত উপনিবেশিক ইতিহাস। পড়তে পড়তে ক্লাসঘরে বানিয়ে ফেলত আদি আমেরিকানদের ঘর-কন্নার মডেল। আরো বড়

যারা তাদের পাঠক্রমে ইতিহাস পড়া থাকলেও বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক কাল পড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হতো না। তাদের বেশি করতে হতো নানা বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমনঃ জ্যোতির্বিদ্যা, মানব শরীরবিদ্যা, তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ফটোগ্রাফি। বিতর্ক সভা ঘরের অভাব হচ্ছিল দেখে, ১৩ বছরের পড়ুয়ারা তো একটা সমবায় ব্যবস্থা চালু কর গোটা ক্লাব বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিল। এমন তুখোড় সব ছেলেমেয়ে তৈরি করছিল স্কুলটা। বৃত্তিমূলক কাজগুলো একদিকে যেমন বাচ্চাদের মনে উপকরণ আর পদ্ধতির পেছনে বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করছিল, অন্যদিকে বৃত্তিগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিকটাও ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বৃত্তি-বিষয় ভিত্তিক পাঠক্রমের সাহায্যে কায়িক প্রশিক্ষণ আর ইতিহাস চর্চা যেমন হচ্ছিল তেমনি অঙ্ক, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, আঁকাআঁকি, সঙ্গীত, ভাষা শিখতে কোন বৃত্তি পাঠ্য বিষয় হিসাবে কাজ করবে সেটা উঠে আসছিল। এমন কি রিডিং বা পাঠ করবার বিষয় হিসাবে কোন বৃত্তিটি উপযুক্ত সে নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। ডিউই বলতেন "বাচ্চারা স্কুলে কিছু করতে আসে,রান্না, সেলাই, কাঠ আর সরঞ্জাম নিয়ে কিছু গড়তে আসে আর এই কাজ করার গুচ্ছকে ঘিরে চলে অঙ্ক করা, পাঠ পড়া, লেখা-জোকা।" রিডিং-এর কাজ তখনই করানো হতো বাচ্চাদের মধ্যে কোন কিছু জানাবার জন্য, সমস্যা সমাধানের জন্য বই পড়ার চাহিদা তৈরি হতো। বই আর বই পড়াকে ডিউই একটা শেখার উপকরণ হিসাবে দেখছেন। ডিউই-র পেডাগজি মূল কথা ছোটদের হাতের কাছে সরেজমিনে অভিজ্ঞতা তৈরির হওয়ার সুযোগ দিয়ে দিতে হবে। এর পরের ধাপটা শিশুরা নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাবে। এই ভাবে বাচ্চারা মডেল খামার বানাতে গিয়ে অঙ্কের নানান খুঁটি নাটি যেমন ভগ্নাংশ আর মাপজোক করা শিখে ফেলে। ওনার মতে কিছু জানতে-শিখতে গেলে মুক্ত মনের প্রয়োজন। কি শিখবে, কি জানবে সে বিষয়ে যদি শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায় তবে জানা শেখার প্রক্রিয়াতে শিশু নিজে থেকেই অংশ নিতে শুরু করে। ভুল করা, বারবার পরীক্ষা করার বিনিময়ে যে জানা শেখা হয় তার গোড়ায় থাকে মুক্ত মন। জন ডিউই বিংশ শতকের প্রথম দিকে এক প্রথিত যশা দার্শনিক। তার দর্শনের প্রথম কথা –

১) তত্ত্ব আর চর্চার মেলবন্ধন,

২) গণতন্ত্রই মুক্তির আধার।

তাঁর কর্মজীবন ও ভাবনার জগৎ জুড়ে এই দুটির আমৃত্য অনুশীলন করে গেছেন, ডিউই। দর্শন যদি মানুষকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ বাতলে দেয়, তবে শিক্ষা হল দার্শনিকের কাছে তার সেই ভালো থাকার তত্ত্বকে চর্চা করার হাতিয়ার। এমনটাই মনে করতেন ডিউই। ডিউই দেখেছেন শিক্ষা নিয়ে সংস্কারমূলক ভাবনা ও কাজ করতে গিয়ে পরিষ্কার দুটো মতবাদের দল তৈরি হয়ে গেছে। এক দলের মতে শিক্ষাকে হতে

হবে শিশুকেন্দ্রিক আর দ্বিতীয় দল মনে করে পাঠক্রম-কেন্দ্রিক শিক্ষার কথা। স্কুলে আসছে একটা শিশু। একটা "ফাঁকা স্লেট" যেন। শিক্ষক হাতে চক-খড়ি নিয়ে তৈরি। মানব সভ্যতার পাতা থেকে জ্ঞান গর্ভ বস্তু জোগাড় করে শিশু স্লেট মনে খস্‌খস করে লিখে দিলেই, পড়ানো শেখানো হয়ে গেলো।

ডিউই-র সক্রিয় শিক্ষা পদ্ধতি মোটেই তা বিশ্বাস করে না। বরঞ্চ একদম উল্টো কথাই বলতেন ডিউই। শিশু যখন স্কুলে আসতে শুরু করছে তখনই তার মন বেশ প্রগাড় ভাবেই সক্রিয়। শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর এই সক্রিয়তাকে যত্ন করে দিশা দেওয়া। স্কুলের বাতাবরণে শিশু যখন প্রথাগত শিক্ষা নিতে স্কুলে আসে সে সঙ্গে করে নিয়ে আসে চারটি আদিম প্রবৃত্তি যোগাযোগ করার প্রবৃত্তি, নির্মাণের ইচ্ছা জানবার উৎসুকতা আর নিজেকে প্রকাশ করার তাড়না। এছাড়াও শিশুর মনে জমা থাকে তার পরিবার – ঘর – পরিবেশ থেকে জোগাড় করা নানান অভিজ্ঞতা। শিক্ষকের কাজ হলো এই কাঁচা মালের রসদকে কাজে লাগিয়ে মূল্যবান সম্পদ তৈরি করা, ডিউই-র এই মত শিশু-কেন্দ্রিক আর পাঠক্রম-কেন্দ্রিক চিন্তাবিদদের পছন্দ হয়নি। আসলে ডিউই চেয়েছিলেন এই দুই মতকে তাঁর তৃতীয় পথ দিয়ে মেলাতে। তিনি মনে করতেন এই বিতর্কের মূলে রয়েছে একটা ধারণা যে শিশুর জীবন- সঞ্জাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্কুলে যে বিষয়ে পড়ানো হবে তার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। এই পূর্ব ধারণা মুক্তি পাই তাহলেই শিশু-কেন্দ্রিক না পাঠক্রম-কেন্দ্রিক এই নিয়ে আর দ্বন্ধ থাকে না। ডিউই-র তত্ত্বের শিক্ষকদের দায়িত্বভার বাড়ে। পাঠক্রম দেওয়া বিষয়গুলিকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মানব সভ্যতার পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানগবাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মানব সভ্যতার পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানগুলিই পাঠক্রমে বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। আর এই করতে গিয়ে সেগুলিকে বিমূর্ত রূপ নিয়ছে। বিমূর্তকে হাতে নাতে নেড়েচেড়ে দেখার রূপ দিতে হবে শিক্ষককে। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতায় ফিরিয়ে আনতে হবে শিক্ষককে। শিক্ষককের কাজ হবে পড়ুয়ার সামনে সমস্যাটা দিয়ে দেওয়া, সমস্যার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। কি করতে হবে সরাসরি বলে দেওয়া নয়। এর জন্য শিক্ষককে হতে হবে পাঠ্য বিষয়টিতে তুখোড় জ্ঞানী, শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আর সেই সঙ্গে শিক্ষকের জোগান দিয়ে যেতে হবে এমন সব উদ্দীপনা যাতে শিশু তার বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্য বিষয়টাকে মিলিয়ে নিতে পারে। আর এ ব্যাপারে শিক্ষককে হতে হবে যথেষ্ট দক্ষ। প্রতিটি স্কুল ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে লুকিয়ে থাকে একটা অন্য পাঠ্যক্রম যা স্পষ্ট কর দেখা না গেলেও এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। পড়ুয়াদের চরিত্র গঠন, তাদের নৈতিক বোধ, রাজনৈতিক অবস্থান স্থির করতে এই পাঠ্যক্রম বেশ জোরদার ভূমিকা পালন করে। ডিউই-র শিক্ষা তত্ত্বে এই লুকানো পাঠ্যক্রমের বিষয়টি বেশ সুস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনাও বেশ মৌলিক। তাঁর মতে প্রকৃত ভাবে,

যথার্থ ভাবে বাঁচতে হলে চাই এক বিশেষ ধরণের চরিত্র গঠনের প্রস্তুতি। এই প্রকৃত বা যথার্থ রূপে জীবনযাপনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অনুশীলনীগুলিকে মেলাতে পিছপা হননি ডিউই। ব্যক্তি মানুষ যখন তাদের বিশেষ বিশেষ গুনগুলিকে নিজের সমাজ গোষ্ঠীর হিতার্থে কাজে লাগায়, অন্যের ভালোর জন্য নিজেকে নিবেদন করে, তখনই তার মধ্যে ঘটে এক ধরণের আত্ম উপলব্ধি। শিক্ষা ব্যবস্থা – স্কুল – পাঠ্যক্রমের কাজ হল পড়ুয়াদের স্বভাব অভ্যাস-চরিত্র-গুণাবলী এই আত্ম উপলব্ধির পথে চালিত করা। স্কুল ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে যে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব এমনটাই মনে করতন ডিউই। আর এই ব্যাপারে শিক্ষকের উপরেই তিনি ভরসা করেছেন। তারা যদি পড়ুয়াদের আত্ম উন্নতির কাজটা সততার সঙ্গে করেন তাহলে সমাজকে ভালর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর কোনো সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। সমস্যাটা হল স্কুলগুলো তৈরিই হয়েছে চলমান সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য , সমাজ বদলের জন্য নয়। এটাও জানতেন বলে ডিউই-র পেডাগজিতে সমাজ বদলানো স্কুল ব্যবস্থা কেমন হবে তার কথা বলা আছে। চলতি স্কুলগুলোর খোল-নলচে বদলে ফেলতে হবে, বলেছেন ডিউই। ডিউই-র তৈরি করা স্কুলের পাঠ্যক্রমে কেন্দ্রে ছিল বৃত্তি। স্কুলটা যেন ছোট্ট এক গণতন্ত্র। অথচ এই বৃত্তি-মূলক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার মধ্যে তিনি আমেরিকার পূঁজিবাদী সমাজের প্রভাব অত্যন্ত সচেতন ভাবে প্রবেশ করতে দেননি। তার বদলে স্কুল চলত সমবায় প্রথায়। আমেরিকার শিকাগো শহরের মধ্যে বাস করেও স্কুলটা যেন অন্য রকম। ডিউই-র মতে স্কুল-জাত পণ্যের অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়ে বেশি জরুরী পড়ুয়াদের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আর স্বচ্ছতা তৈরি করা। উৎপাদিত পণ্যেরসঙ্গে জড়িয়ে থাকে হাত আর মস্তিষ্কের একতা। স্কুলের দেওয়াল পেরিয়ে যে বিশাল আমেরিকার সমাজ ছড়িয়ে তার সাথে ডিউই স্কুলের সমাজ ব্যবস্থার বড়ই অমিল। ডিউই তাই স্কুলটাকে বলতেন "ভ্রূণ" সমাজ। শিল্পোন্নত আমেরিকাকে প্রতিফলিত করা স্কুলের কাজ নয় বরং আগামিতে যে সমাজ গড়ে উঠবে তার-ই ভ্রূণাবস্থা এই স্কুল। ১৯০৪ এ ডিউইকে এই স্কুলের ভার ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়। ক্ষমতার লড়াইয়ে তাঁকে হটিয়ে দেওয়া হয়। ডিউই-র নিজের স্কুল হারালেও তাঁর শিক্ষা সংস্কারের কাজ আর ভাবনা থেমে থাকে না। নিজের শিক্ষা চিন্তার কথা বলতে ঘুরে বেড়ান দেশে দেশে চিন, জাপান, মেক্সিকো, তুর্কি, সোভিয়েত রাশিয়া। কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানান বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের বিরুদ্ধে। ডিউই-র মতে এই শিক্ষাক্রম চলতি অগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার রসদ জোগায়, তৈরি করে সেই সব শ্রমিকদল যাদের উপর ভর করে বাড়-বাড়ন্ত ঘটে আমেরিকান শিল্পোন্নয়ন। কড়া সমালোচনা করেন শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা তত্ত্বের ভাবপ্রবণতার। আজও ডিউই-র ভাবনাকে ঘিরে ওঠে বিতর্কের ঝড়। আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনার সময় ডিউই দাঁড়ান পরশপাথর হয়ে।

(১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্মাদেশ্বর ঝা- এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

শিক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ভাবনা, লেখালেখি, স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পিছনে কাজ করেছিল নিজের স্কুল জীবনের তিক্ত স্মৃতি আর পরের দিকে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের শিক্ষা নীতি।

স্কুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে সুখস্মৃতি ছিল না। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলেন ছোটবেলায়। আবার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলেও গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনার জন্য বিদেশেও যান। কিন্তু কোন ধরণের স্কুলই তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। পড়া অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরে আসেন। প্রথাগত লেখাপড়া রবীন্দ্রনাথকে ধরে রাখতে পারেনি। গান বাজনা, শরীর চর্চ্চা, ভাষা, দর্শন, ইতিহাস – সবই পড়েন কিন্তু সেটা স্কুল পরিবেশে নয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা সম্বন্ধে একটা ধারণা তাঁর মনে সলতে পাকাচ্ছিল।

বিলেত ফেরত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যান পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনার কাজে। চাষিদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান। অশিক্ষিত, দরিদ্র, অবহেলিত মানুষগুলোর দশা দেখে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। গরীব মানুষগুলোকে পিষে মারছে সমাজের উঁচুতলার শক্তিগুলো-: খাজনার জন্য জমিদারদের বেতের আঘাত, ঋণশোধের জন্য মহাজনদের হুমকির ঠেলায় ভিটে মাটি ছাড়তে হয়। এর উপর আছে গোরা সৈন্যদের লাঠির ঘা। আর জাতপাতের ওজর তুলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেষ্টা করেন কোন পথে আসবে অত্যাচার থেকে মুক্তির উপায়। রবীন্দ্রনাথ মুক্তির উপায় হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এর সঙ্গে চাই গ্রাম জীবনে স্বনির্ভরতা। গ্রামের মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে, নিজস্ব নেতৃত্বে নিজেদের তাগিদে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। শিক্ষা আর গ্রাম পঞ্চায়েত একযোগে কাজ করবে এই সাধারণ মানুষগুলোর জীবনে অর্থনৈতিক আর সামাজিক পরিবর্তন আনবার লক্ষ্যে। গ্রামের মানুষের সমবায় জীবনধারা তৈরি করবে সেই শক্তি যা রুখে দেবে যুগযুগান্ত ধরে চলে আসা নিপীড়ন, শোষণের ইতিহাস।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও গ্রাম সমাজে সমবায় আন্দোলন নিয়ে পরীক্ষা –নিরীক্ষা শুরু হলো। স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানে। বাঙলা ভাষায় পড়া শেখা চলত। ইংরেজীও শেখানো হতো। স্কুলের সাথে তৈরি করলেন হাসপাতাল। গ্রামের মানুষদের নিয়ে তৈরি হলো সমবায় সমিতি। চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা

চলল। এক সক্রিয় সমাজ জীবনের সাধনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি পদ্মা বেয়ে হাউস বোটে করে ঘুরতেন গ্রামের পর গ্রাম। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন, সুখ দুঃখের কথা শুনতেন। শিলাইদহের এই অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে এগিয়ে নিয়ে গেল শান্তিনিকেতনে। ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর শুরু হলো শান্তিনিকেতনের আশ্রম স্কুল।

বহুযুগ আগে এই দেশের বনতলে গাছগাছালির নিরিবিলি পরিবেশে, আশ্রম বাতাবরণে গুরু গৃহে বসত তপোবন। শিষ্যেরা এই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে গুরুর কাছে পাঠ নিতেন। শান্তিনিকেতনের লাল মাটি আর শাল পিয়ালের বনজ মাটিতে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে আনলেন আদি যুগের তপোবন। শিক্ষকরা যেন উদ্যান দেখভাল করা মালি। আর পড়ুয়ারা সব বাগানের গাছপালা। যত্ন আর তদারকিতে পড়াশোনা শুরু হলো। বসল প্রকৃতি পাঠের আসর। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্বকে মনে রেখে বাংলায় লেখাপড়া শুরু হল। ইংরেজি ভাষা শিক্ষাও চলত। প্রকৃতির কোলে খেলতে খেলতে, গার্হস্থ্য কাজ করতে করতে ছোটরা শিখবে। সঙ্গে গান, নাচ, আঁকা, নাটক। আনন্দ-মুখর, উৎসব-পূর্ণ হবে সেই শেখা। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের মতো আধুনিক বিষয়গুলির চর্চ্চা শুরু হল। সব বিষয়গুলিতে থাকল হাতে কলমে করে দেখার সুযোগ। পাঠ্যবই মুখস্থ করে শেখার বিপক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্প বলার ছলে চলত ইতিহাস শিক্ষা। নাটক আর কবিতাপাঠ শিক্ষণ পদ্ধতিতে স্থান পেল। শিক্ষার দুই ধরণের লক্ষ্য। একটা ক্ষুদ্র লক্ষ্য; যার উদ্দেশ্য শিক্ষার হাত ধরে জীবিকার সন্ধান করা। আর শিক্ষার বড় উদ্দেশ্যটা হল- মানব জীবনে পরিপূর্ণতা আনা, বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চ্চা পেরিয়ে সৃজনশীলতা আর সৌন্দর্য বোধের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শিক্ষার বড় দিকটা দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা ক্ষুদ্র লক্ষ্যটিকে অবজ্ঞা করেনি। তাঁর জীবিকামুখী শিক্ষাতে স্থান পেয়েছিল গ্রামীণ হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, কৃষিবিদ্যা, হাতে কলমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ সরকার ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করেছিল তাতে ইংরেজি শিক্ষা স্থান পেয়েছিল। সেই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল একধরণের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি করা যারা সরকারি অফিসে কাজ করবে, ব্রিটিশ ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে সাহায্য করবে। তাই সেই সময়ের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্য ছিল কেরানি, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, দারোগা তৈরি করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে তৈরি হয় দুইটি শ্রেণী। এক শ্রেণী যারা এই ধরণের শিক্ষায় শিক্ষা প্রাপ্ত। আর দ্বিতীয় শ্রেণী যারা এই শিক্ষার বাইরে রয়ে গেল। যারা বাইরে রয়ে গেল তারা বেশিরভাগই ছিল গ্রামের মানুষ – চাষী, কামার, কুমোর, তেলী। এই সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে শহুরে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রাক – উপনিবেশ ব্যবস্থাতে প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার চল না থাকলেও এই দেশের সব ধরণের মানুষের মধ্যে এক

সংস্কৃতি প্রবাহ বয়ে যেত। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই প্রবাহ স্তব্ধ হল।

ভারতের জন্য রবীন্দ্রনাথ এক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বললেন। যে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে এই দেশের নিজস্ব জ্ঞান চর্চ্চার সম্পদ ও পদ্ধতি উদ্ধার করা, ও প্রতিষ্ঠা করা। অর্থনীতি, কৃষি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা নিয়ে ভারতের যে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও জ্ঞানের আকর আছে তাকে সবার সামনে তুলে ধরা। গ্রাম জীবনের আনাচে কানাচে যে বিজ্ঞান প্রযুক্তি লুকিয়ে আছে তাদের টেনে এনে বসাতে হবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাতে। এমনটাই মনে করলেন তিনি। শিক্ষা যেমন দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে তেমনি পড়ুয়াদের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করাবে বিশ্বের নানা দেশের নানা জাতির সংস্কৃতিকে।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তৈরি করলেন পাঠভবন আর বিশ্বভারতী। দেশীয় জীবন ধারার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে বিশ্বভারতী। অন্যদের থেকে ধার করা জ্ঞান নয়। জ্ঞান সৃষ্টি হবে এই বিশ্বভারতীর কক্ষে, ক্লাসঘরে। বিশ্বের জ্ঞান একত্রিত করে, চর্চ্চা করে, উন্নত করে তা ছড়িয়ে দেওয়া দেশের ভবিষ্যদের মধ্যে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে বিশ্বের নানান গবেষক আর স্রষ্টাদের। তাঁদের জ্ঞান বিতরণের জন্য। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিশ্বভারতীর একটা বড় কাজ হবে গ্রামীণ জীবনযাত্রায় উন্নতি আনা। বিশ্বভারতীর হাত ধরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা গ্রাম উন্নয়নে বিস্তার লাভ করল। তৈরি হল শ্রীনিকেতন। শিক্ষাসত্র নামে স্কুল খুললেন। গ্রামের বাচ্চাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠল শিক্ষাসত্র। গ্রামের বাচ্চারা যাতে বড় হয়ে জীবিকা বেছে নিতে পারে, গ্রাম জীবন ধারায় যাতে উন্নতি আসে তার জন্য কাজ শুরু হল।

চাই উন্নত স্বাস্থ্য ও উন্নত সমাজজীবন। কৃষিতে গবেষণারমূলক কাজ শুরু হলো। শ্রীনিকেতনের স্কুল ব্যবস্থাতে সবাইকে হাতের কাজ শিখতে হত। শুরু হলো সমবায় সমিতি, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি ঋণ দান, বীজ ঘর স্থাপিত হলো। পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরির কেন্দ্র তৈরি হল। গ্রামীণ কল্যাণ দপ্তর রাস্তাঘাট তৈরি করা, পুকুর খোঁড়া, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি চালু করার কাজে হাত দিল। গ্রামীণ সমাজ উন্নয়নে শ্রীনিকেতনে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল তা আজও আমাদের পথ দেখায়।

শিক্ষা যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাই চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের চোখে ছাত্র– ছাত্রীরা হবে বিশ্বের মানব-মানবী, যারা সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে। ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত হয়ে তারা বিশ্ব শান্তি আর মৈত্রীর জন্য কাজ করবে। আর এমন মানুষ মানুষী তৈরি করতে হলে চাই তেমন শিক্ষক-শিক্ষিকা ,যারা পড়ুয়াদের প্রশ্ন করতে শেখাবে, মানসিক অভিযানে উৎসাহিত করবে। এই শিক্ষক–শিক্ষিকারা তৈরি করবে এমন ছাত্র–ছাত্রী যারা কাজে উদ্যমী ও সাহসী হবে, চিন্তা ভাবনায় আর কর্মোদ্যোগে দৃপ্ত হবে।

(১৮৬৩-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ)

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রভানন্দ-এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

শিষ্য সম্পর্কে গুরুর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য নরেন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনি একদিন বিশ্ববাসীর শিক্ষক হবেন। হয়েছিলও তাই। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। চিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকান্দ তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বিশ্ববাসীকে জানান দিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে। বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন সেই ভারতবর্ষকে যে দেশে জ্ঞান চর্চা, ধর্মপথ সহিষ্ণুতা আর সমন্বয়ের কথা বলে। সেদিনের সেই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সবাই পরাক্রমী পশ্চিমী দুনিয়ার অধিবাসী। তাঁরা যে সব দেশ থেকে এসেছিলেন সেই সব দেশের শিক্ষায় দীক্ষায় ধোপদুরস্ত, স্বাধীন, ধনী। আর স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন কোন ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করছেন? সেই ভারতবর্ষ যে পরাধীন। যার কপালে লেখা দীর্ঘ দিনের জাতপাতের ভেদাভেদ, ছোঁয়াছুয়ি, কুসংস্কার তিলক। বিশ্বব্যাপীর মনে ছাপ পড়ে গেছে দীন-হীন এক দেশের চেহারা। স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত বাণী সভায় বসে থাকা শ্রোতামন্ডলীর মন থেকে মুছে দিতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের মলিন সেই রূপ, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে স্বামীজি প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতবর্ষের সেই আদর্শ যা সকল মানুষের সহাবস্থানে বিশ্বাস করে, সকলের কল্যাণে নিয়োজিত থাকাতে বিশ্বাস করে। পশ্চিম দুনিয়ার মানসচক্ষু খুলে দিলেন বিবেকানন্দ। সারা ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে ঘুরে মানুষের সাথে মিশে যে জ্ঞান অর্জন করে ছিলেন সেই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমে। শিক্ষার লক্ষ্যই তো সত্যকে তুলে ধরা। স্বামী বিবেকানন্দ তা-ই করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর ব্রত সম্পাদনের উপায়। সমাজের যা কিছু মন্দ যা কিছু খারাপ সেটাকে শোধরাবার শিক্ষা। বিশ্বাস করতেন যে মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের অসীম জ্ঞান আর ক্ষমতা। চক্‌মকি পাথরের ভিতরে যেমন লুকিয়ে থাকে তার জ্বলে ওঠার ক্ষমতা। একটু ঘর্ষণেই যা-জ্বলে ওঠে। তেমনি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা পূর্ণতা প্রকাশিত হয় শিক্ষার সাহায্যে। শিক্ষার হাত ধরে সম্ভাবনাগুলো সম্পূর্ণ রূপ নেয়। বিবেকানন্দ মনে করতেন যে শিক্ষা মানুষকে দৈনন্দিনের জীবনযুদ্ধে লড়াই করার রসদ জোগায়। সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা মানব চরিত্রকে দৃঢ় করে, সিংহের মতো সাহসী মানুষ তৈরি করে। সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা লোক হিতের চর্চা করে। তাই বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা মানুষ তৈরি, চরিত্র-গঠনের উপায়। শিক্ষিত

মানুষ হয়ে উঠবে এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে নিজের বুদ্ধি বৃত্তিকে উন্নত করতে শিখবে। যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জয় করে অপরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। শিক্ষক আর শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে তা বলতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দ শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বলতেন। গল্পটার মূলকথা হলোঃ- চাষি যেমন তার খেতে সেচের জলের ব্যবস্থা করার জন্য জল প্রবাহের পথের সব বাধা ভেঙ্গে দেন। তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকের কাজ হলো পড়ুয়ার শিক্ষা গ্রহণের পথে সকল ধরণের বাধা দূর করে দেওয়া। শিক্ষার পথে বাধাগুলো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ– দুই-ই হওয়া সম্ভব। বাহ্যিক বাধাগুলি দূর করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার সুযোগ ও সম্পদের অবাধ বন্টন। সবাই যেন সমান ভাবে গুণসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ ভোগ করতে পারে। শিক্ষার পথে আরেকটি বাহ্যিক বাধা– আর্থিক দূরাবস্থা। অর্থ যেন শিক্ষাগ্রহণে বাধা না হয়। তার জন্য চাই সমাজের আর্থিক অনুন্নতি দূর করা। আর এর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক– রাজনৈতিক অস্থিরতাগুলো দূর করা।

অন্তরের বাধা দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হলো শিক্ষক-পড়ুয়ার সম্পর্কে গভীরতা আনা। পড়ুয়ার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা উন্নত করা, সে যেন যে কোন বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি-পরিবর্তনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে শেখে। শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে আস্থা রাখতে হবে পড়ুয়ার অন্তরের অন্তহীন সম্ভাবনা আর ক্ষমতার উপর। স্বামী বিবেকানন্দ সেই সমাজ তৈরি করার জন্য কাজ করে গেছেন যে সমাজ তার সব ধরণের সদস্যকে সবল ও সক্ষম হয়ে ওঠার সুযোগ দেবে। তাই বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনায় সমাজের প্রান্তিক, দুঃস্থ মানুষেরা স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতি তখনই হবে যখন ভারতবর্ষের দীনহীন দরিদ্র মানুষ সমর্থ, স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। তিনি চেয়েছেন শিক্ষার মাধ্যমে যেন প্রান্তিক মানুষ তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। তিনি এমন শিক্ষার কথা বলেছেন যে শিক্ষার জোড়ে সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের দল স্বনির্ভর হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে এবং নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেবে। পরাধীন ভারতের স্বাধীন হওয়ার পথ এই সব মানুষের শিক্ষায় নিহিত রয়েছে তেমনি মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষের শরীরের শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে যেমন শরীর সতেজ থাকে। তেমনি দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবাহ সেই দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। তাই তিনি চেয়েছেন এই দেশের সুবিধাভোগী, ধনী স্বচ্ছল শ্রেণীর মানুষেরা যেন দীন দরিদ্র ভারতবাসীর পাশে এসে দাঁড়াক। আর এই কাজে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবদলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এক তাল লোহায় হাতুড়ির ঘা পড়ছে। লোহার তাল হলো আমাদের শরীর আর মনের হাতুড়ি দিচ্ছে ঘা। হাতুড়ির আঘাতে আঘাতে লোহার তাল থেকে তৈরি হচ্ছে মন যা চায়। মনের এই সৃজনশীল ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন বলেই স্বামী বিবেকানন্দ তেমন শিক্ষার কথা বলতেন যা

মনকে তৈরি করবে। যথার্থ তৈরি মনের ছাপে তৈরি হবে চরিত্র। শিক্ষকের সহানুভবী মন নিজেকে নামিয়ে আনতে পারবে পড়ুয়ার জানা বোঝার স্তরে। চোখ-কান দিয়ে তিনি দেখবেন শুনবেন। পড়ুয়ার মনকে বুঝতে চেষ্টা করবেন। আর তখনই তিনি যথার্থ ভাবে শেখাতে পারবেন। সেই শিক্ষাকে থেকে তৈরি হবে এমন মানুষ যার মধ্যে সম্যক ভাবে প্রকাশ পাবে দৈহিক সৌষ্টভ, বুদ্ধি বৃত্তি, আবেগ অনুভূতি আর শুভবোধ। এই শিক্ষা মানুষের অন্তরকে ঘষে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুলবে। জীবনভর চলবে এই শিক্ষা গ্রহণ। এই শিক্ষার ফলে তৈরি হবে নতুন মানুষ যার মধ্যে প্রকাশ পাবে জ্ঞান, কর্ম, আচরণ আর মনঃ শক্তির অপূর্ব সমন্বয়। আর এই মানুষের হাত ধরে গড়ে উঠবে নতুন সমাজ যেখানে থাকবে না কোন ধরণের ভেদাভেদ।

ভারতীয় সংবিধান সকলের জন্য শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে যা স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাস্তবে এর রূপায়ণ এখন দূর অস্ত। স্বামী বিবেকানন্দের "জীবনভর শিক্ষা"র ধারণাটিও আজ ভারতসহ বহু দেশে গৃহীত হয়েছে। এর ফলে সমাজের দূর্বল প্রান্তিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ছোট বয়সে পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও বড় হয়ে শিক্ষা লাভ করছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস তৈরি হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ যে সমাজব্যবস্থার কথা ভাবতেন সেখানে অবহেলিত বঞ্চিতরা নিজেদের নিয়তির নিজেরাই নিয়ন্তা হবে– সেই সমাজব্যবস্থা আজও তৈরি হয়নি। আজও আমাদের সমাজ তার নিজের স্বার্থে শিক্ষাকে ব্যবহার করে চলেছে। আর তার ফলে সমাজের নিচুতলার মানুষেরা নিজেদের স্ব-অধীন হওয়ার ক্ষমতা আজও হারাচ্ছে।

(১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

কৃষ্ণ কুমার- এর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

কথায় বলে " আমরা অনেকটা তা–ই, যা আমরা খাই"। বিষয়টাকে আরো গভীরে নিয়ে গেলে যা উঠে আসে তা হোল আমরা যা ভাবি, বা করি, যেভাবে জীবন যাপন করি তার পিছনে নিজস্ব জীবন বোধ কাজ করে। শিক্ষা নিয়ে গান্ধীজীর ভাবনা চিন্তা সেরকমই তাঁর গভীর জীবন বোধেরই ফসল। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধীতায় মুখর হয়েছিলেন বহু নামজাদা ভারতীয়। তাঁরা কেউ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কেউ বা সমাজ সংস্কারক, কেউ বা কবি – সাহিত্যিক। ব্রিটিশ শাসনের বিরোধীতা করার সাথে সাথে তাঁরা ব্রিটিশ সকারের ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যাখ্যানের স্বর গান্ধীজীর মতো এতো জোরালো এবং এতো ক্ষুরধার ছিল না। উপনিবেশ প্রথা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীজী সরব হয়েছিলেন। কথায় বলে কান টানলে মাথা আসে। ঔপনিবেশিকতার সমালোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী পশ্চিমী সভ্যতার চালচলনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের হাত ধরে পশ্চিমী- সভ্যতা সত্য ও অহিংসার উপর আঘাত হেনেছে। পশ্চিমী সভ্যতা তার সমস্ত শক্তি, শিল্প, উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে পরদেশ, পরজাতিকে আক্রমণ করেছে, ধ্বংস করেছে, লুটপাট করেছে। গান্ধীজীর কাছে পাশ্চাত্য-সভ্যতা প্রগতির প্রতীক নয়, অনুকরণের আদর্শও নয়। তার মানে গান্ধীর মতামত চির প্রচলিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বান্দ্বিকতারই প্রকাশ? ঔপনবেশিক শিক্ষার বিকল্প হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষার যে আদর্শের কথা গান্ধীজী বলেছিলেন তাকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বান্দ্বিকতার আলোকে দেখলে চলবে না। শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অবশ্যই এক দ্বন্দ্ব উত্থাপন করেছেন। মানুষ বনাম যন্ত্রের দ্বন্দ্ব। মানুষ বলতে তামাম মানব সত্তা। আর যন্ত্র বলতে গান্ধীর কাছে উঠে এসেছে শিল্পোন্নত পশ্চিমী সভ্যতা। যে শিল্প মানুষের স্বায়ত্তকে খর্ব করে।

গান্ধীজী প্রণীত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত গাঁথা ছিল স্ব-নির্ভরতায়, আত্ম-সচ্ছলতায়। তাঁর শিক্ষা ভাবনায় উঠে এসেছে এক স্বপ্নরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। যে স্বপ্নরাষ্ট্রের নাগরিকেরা হবেন এমন মানুষ - যাঁরা পরিশ্রমী, আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন উদার মনের। এই রকম অনেক মানুষ একজোট হয়ে তৈরি করবে ছোট ছোট স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এইভাবে তৈরি হবে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। ছোট অথচ স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই গান্ধীর

বুনিয়াদী শিক্ষায় রূপায়িত হয়েছে। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতীয় গ্রামগুলির এই ধরণের স্বনির্ভর গোষ্টীতে পরিণত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রয়েছে। ভারতীয় গ্রামগুলি যুগ যুগ ধরে স্ব- নির্ভর ছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সেই গ্রামীণ স্ব- নির্ভরতা ও স্বায়ত্তকে ধ্বংস করেছে। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অর্থ গ্রামকে সক্ষম করে তোলা। গ্রামীণ অর্থনীতির স্বয়ংসম্পুর্ণতা ফিরিয়ে আনা, গ্রামের রাজনৈতিক মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা।

বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাই হল গ্রামকে এই লক্ষ্যে উন্নত করে তোলা। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে উৎপাদনশীল কাজকর্মে। তাদের মধ্যে সেই সব মূল্যবোধ আর আচার- আচরণ চারিয়ে দিতে হবে যা সমবেত-গোষ্ঠী জীবনের অনুকূল হবে। গান্ধীজী যে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, ঠিক সে সময়টাতে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে এক আলোড়ন। শিল্পায়নের হাত ধরে পশ্চিমী আধুনিকতার ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি-রাজনীতির অলিন্দে। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের হাত ধরে ধনতন্ত্রের দৌড় শুরু হয়েছে এ দেশে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে শুরু হয়েছে শিল্পায়ন। এই নিরিখে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার অবস্থান কোথায়? তিনি কী প্রযুক্তি-শিল্পায়ন বিরোধী? নাকি তিনি পশ্চিমী-ধাঁচের আধুনিকতার বিরোধী? যে আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ইউরোপ ভিন্ন অন্য দেশগুলিকে শোষণ করেছে? আসলে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন ভারতের মাটিতে শিল্পায়ন আর ধনতন্ত্রের গতিময়তা কিছুটা হলেও কমুক। তিনি চেয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে ভারত সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে উন্নত হয়ে উঠুক। গান্ধী বুঝেছিলেন-দিন যত এগোবে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য-দুনিয়া তার শিল্প প্রযুক্তি আর পণ্যবাজার নিয়ে ভারতের উপর আছড়ে পড়বে। গ্রাম ভিত্তিক ভারতকে এই চাপ সহ্য করার জন্য রাজনৈতিকভাবে সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। এর উপর ভারতের নিজস্ব ধনতন্ত্রবাদী শিল্পপতি, বণিকের দলবলও রয়েছে। সেইজন্য সর্বপ্রথমে চাই তেমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে ভারতের আপামর জনসাধারণ, গ্রামবাসী আধুনিকতম উৎপাদন প্রক্রিয়াকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। শিল্পায়নের রকম সকম এমন হবে যার মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ঘটবে। আর এই মর্মে বুনিয়াদী শিক্ষার ভূমিকাও সুনির্দিষ্ট হবে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে গ্রামের মানুষ, দেশের সাধারণ মানুষের অধিকারে থাকবে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পণ্য। আর ঠিক এই দক্ষতা তৈরি করবে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা। সাধারণ ঘরের শিশুদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটাবে শিক্ষা ব্যবস্থা।

তাই তো স্কুল-পাঠ্যক্রমে উৎপাদনশীল হাতের কাজ অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছিলেন গান্ধীজী। আর পাঁচটা পাঠ্য বিষয়ের মতো হাতের কাজ শেখাটাই যেন সাধারণ একটা বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। বরং হাতের কাজ শিক্ষাটি হয়ে উঠবে সমগ্র

পাঠক্রমের মেরুদণ্ড। আর এই চিন্তাধারার পিছনে কাজ করছে আবার সেই অনন্য জীবনবোধ, আমূল সংস্কারমনস্কতা। জাতিভেদ-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে নিচু জাতের মানুষেরাই সাধারণভাবে হাতের কাজের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছেন। সুতোকাটা, তাঁতবোনা, মাটির শিল্প, চামাড়ার কাজ, ঝুড়ি বোনা, ধাতুর কাজ, বই বাঁধাই, প্রভৃতি উৎপাদনমুখী কাজগুলির পিছনে যে জ্ঞান লুকিয়ে আছে তা ওই নিচু জাতের মানুষগুলিই কেবল জানে। ওই ধরণের জ্ঞানচর্চ্চা সমাজের নিচু বর্গের মানুষগুলিই করে এসেছে। যাদের মধ্যে অনেককেই আমরা অস্পৃশ্য মনে করে এসেছি। ভারতের দেশজ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরবর্তী কালে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা-দুটোই সেই সব দক্ষতা (যেমন স্বাক্ষরতা) ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছে যা সমাজের উচ্চ-বর্গীয়দের কুক্ষিগত। দুই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজ-সংক্রান্ত জ্ঞানচর্চ্চা কোনো জায়গা পায় নি। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম ও সমাজ দর্শন সমাজের নিচুতলার শিশুদের পক্ষ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এইভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা বলতে প্রতীকি অর্থে যা বুঝি তাতে বদল ঘটল। আর শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ সুবিধার প্রচলিত কাঠামোতে বদল ঘটল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন স্কুলগুলি যেন স্ব- নির্ভর হয়ে ওঠে। স্বনির্ভরতার পিছনে দুটো যুক্তি কাজ করেছিল। একটা কারণ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। দরিদ্র সমাজ সকল শিশুর শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হবে, যদি না স্কুল তার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সম্পদ ও আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থা নিজেই না সৃষ্টি করে নেয়। দ্বিতীয় কারণটি রাজনৈতিক। আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাই স্কুলকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে পারে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বায়ত্ত গান্ধীজীর অত্যন্ত প্রিয় দুটি মূল্যবোধ। আর সত্য ও অহিংসা ভিত্তিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বায়ত্ত।

কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অন্যের উপর পরনির্ভরশীল হলে তার পক্ষে খুব বেশি দিন ধরে সত্যনিষ্ঠ থাকা সম্ভব নয়। এই ধরণের ব্যক্তি বা সংগঠনকে এমন কি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হতে হলেও, যার পরিণাম হিংসা অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীর শিক্ষা নীতির বিপরীত মেরুতে রাষ্ট্রায়ত শিক্ষাব্যবস্থা অবস্থান করে। রাষ্ট্র ও স্কুলের বিরোধ তখনই মেটানো সম্ভব যখন স্কুল তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নিজেই সৃষ্টি করে নেবে।

উৎপাদনশীল স্কুলব্যবস্থার কথা কিভাবে মাথায় এলো? জন রাসকিনের লেখা "আনটু দ্য লাস্ট" বইটা পড়েছিলেন গান্ধীজী। তিনটি বার্তা পেয়েছিলেন বইটি থেকেঃ–

১) ভালো অর্থনীতির অর্থ যার ছত্রছায়ায় সব্বার উপকার হয়।

২) বুদ্ধি বা মানসিক শ্রম থেকে উপার্জিত ধনের মূল্য আর দৈহিক শ্রম করে উপার্জনের মূল্যে কোন ফারাক নেই। উকিলের ওকালতি থেকে রোজগারের যা মূল্য নাপিতের

চুল কেটে যে টাকা উপার্জন হয়, তার মূল্যে কোনো ভেদ নেই।

৩) মজুর বা কারিগর হিসাবে বেঁচে থাকাতেই বাঁচার মতো বাঁচা যায়।

রাসকিনের বইয়ে পড়া বার্তাগুলো বাস্তবে রূপায়ণ করবেন, এরকমই সিদ্ধান্ত নেন গান্ধী। ১৯০৪ আর ১৯১০ –এ যথাক্রমে তৈরি করেন ফিনিক্স খামার আর তলস্তয় খামার। গান্ধীজী তখন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসি। এই দুই খামারের গোষ্ঠী জীবনে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উৎপাদনশীল স্কুলের বীজ লুকিয়েছিল। তলস্তয়ের মুক্তিকামী চিন্তাধারার অংশীদার ছিলেন গান্ধীজী। তিনি তাঁর শিক্ষাব্যাবস্থার পাঠ্যক্রমের প্রেক্ষিতে শিক্ষকের স্বায়ত্ত অধিকারের কথা বলে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষককে আমলাতন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। ঔপনিবাশিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের কাজ হলো পাঠ্যপুস্তককে আদ্যন্ত, হুবহু অনুসরণ করে পাঠদান করা। কারণ আমলাতন্ত্র যা চায়, যে জ্ঞান বিতরণ করতে চায় তা ওই পাঠ্যবইয়ের ছত্রে ছত্রে ভরে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকের কাজ হলো সেই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। গান্ধীজী শিক্ষকের এই বই-মুখীতা ঘুচিয়ে দিলেন। শিক্ষককে পাঠদানে হতে হবে মৌলিক, যা পাঠ্যপুস্তক দিতে পারবে না। বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষককে স্বাধীনতা দিল। রাষ্ট্রনির্দিষ্ট পাঠদান থেকে তাঁকে মুক্তি দিল। ক্লাসঘরে শিক্ষক স্বাধীনপ্রাণ ব্যক্তি যেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চলবে না। গান্ধীজী ক্লাসঘরে, শিক্ষায় ধর্মকেও ঢুকতে দেননি । সকল ধর্ম যে মানবিক সত্যের কথা বলে তা চর্চ্চা করে দেখাতে হবে শিক্ষককে তাঁর প্রাত্যাহিক জীবনে, শিক্ষকের নৈতিকতার উপর এতটাই দাবী করাছিলেন গান্ধীজী। আশ্রমিক পরিবেশে শিক্ষক- শিক্ষার্থীর আদান-প্রদান ঘটবে। শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপনের উৎকর্ষতায় শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে।

বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন, রূপায়িত হয়েছিল দেশের কোণে কোণে। আবার বিরোধীতাও করেছিলেন অনেকে। বিরোধীতা করেছিল তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক মহল। ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে শুরু হয়েছে শিল্পায়ন আর আধুনিকীকরণ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে রাষ্ট্রের উপর। শিক্ষাক্রমে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটেছে। ভারত সাকার করতে চাইছে সেই স্বপ্ন, যেখানে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রই দেশের প্রধান চালিকা শক্তি, যেখানে তৈরি হচ্ছে একের পর এক শিল্প-কারখানা। সবার জন্য উচুঁ মানের বেঁচে থাকার উপায়ের হাতছানি। এসবই তো গান্ধীভাবনার বিপরীত মেরুর জিনিস। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা এতে বেমানান। ভারতের সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন, শিল্পপতি-রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী এদের কারুর কাছেই বুনিয়াদী শিক্ষার আবেদন সাড়া ফেলতে পারেনি। বরং ১৯৬০ এর দশকের "উন্নয়ন পরিকল্পনা" বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো দূরে ঠেলে দেয়।

(১৮৭০-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ)

মারিয়া মন্টেসরি

হেরম্যান রোহর্স- এর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ছোটদের বাড়ি বা চিল্‌ড্রেনস্ হাউস। নতুন ধারার শিক্ষা আন্দোলনের তীর্থভূমি। এই বাড়ির ভিতর চলছে এক কর্মযজ্ঞ। ছোটরা শিখবে, তাই চলছে প্রস্তুতি। শেখার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে – নানান পড়া-শেখার সামগ্রী সাজানো রয়েছে, সেইসব সামগ্রী নেড়ে চেড়ে তাদের শেখা শুরু হচ্ছে। বাচ্চারা শিখছে নিজে নিজেই। মুক্ত শেখা। শিক্ষক রয়েছেন তবে তিনি সাহায্যকারীর ভূমিকায় রয়েছেন। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখছে – একে অপরকে দেখে শিখছে। পড়ুয়ারা এখানে স্বাধীন, সক্রিয়। এই শেখার পরিবেশে পড়ুয়াদের আচার আচরণ লক্ষ্য রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। খেয়াল রাখছেন শিক্ষণ সামগ্রীগুলো যেন বাচ্চাদের ব্যবহারের সুবিধাকে মাথায় রেখে সাজানো থাকে। উপকরণ হাতে নাতে ব্যবহার করে বাচ্চাদের যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেটাকেও নজর রাখছেন শিক্ষক শিক্ষিকা। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা ব্যবস্থার কাজ হলো শিশুর সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শেখার পরিবেশ প্রস্তুত করা। বাচ্চারা সেই পরিবেশে আসবে, থাকবে আর শিখবে। শিশুর অন্তরের বিকাশ যেমন হবে, তেমনি তার বাইরের বিকাশও হবে। শরীরে মনে শিশু উন্নত হবে। শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি যাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে, বিকশিত হয়, সেটাও খেয়াল রাখা হবে। আর এই গোটা শিক্ষা পদ্ধতির মূল নীতি হলো শিশুকে শ্রদ্ধা করা, শৈশবকে শ্রদ্ধা করা, মনে প্রাণে বিশ্বাস করা মানব জীবনের সৃজনশীলতা বহতা রয় শৈশবের মধ্যেই। শৈশবের প্রতি এই অসম্ভব বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে নতুন ধারার শিক্ষা ভাবনায় জোয়ার এনেছিলেন এক স্নায়ু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁর নাম মারিয়া মন্টেসরি। মারিয়া ছিলেন ইতালির মানুষ। তিনি হলেন প্রথম মহিলা, যিনি ডাক্তারি পাশ করেন। এক মানসিক হাসপাতালে কাজ শুরু করেন তিনি। তাঁর কাজ ছিল ওই হাসপাতালের মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েকটি শিশুর চিকিৎসা ও যত্ন করা। মারিয়া ওদের সেবা করতেন আর দেখতেন কী ভাবে শিশুগুলো নিজের অক্ষম অবস্থাকে অতিক্রম করে খেলাধূলা করে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর খেলার জন্য যে অদম্য ইচ্ছে মারিয়াকে তা বিস্মিত করে। তিনি ওদের ইন্দ্রিয়বোধগুলো সচেতন করে তোলার জন্য প্রচুর অনুশীলনী ও একসারসাইজ (শারীরিক ও মানসিক অনুশীলনী) করাতে শুরু করেন। শিক্ষাতত্ত্ব নিয়েও তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। দার্শনিক–শিক্ষাবিদ রুশোর ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হন। আর শিক্ষা নিয়ে তাঁর তত্ত্ব, ভাবনা

বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য তৈরি করেন একটা ছোটদের বাড়ি বা চিলড্রেনস হাউস। রোম শহরের এক কোণে সান লেরেঞ্জো বস্তি। সেই বস্তির পরিবেশে পরিবর্তন আনতে তৈরি করেন ছোটদের বাড়ি। বাবা-মা-অভিভাবকরা কাজে বেরিয়ে গেলে বস্তির গলিতে গলিতে খেলে বেড়ায়-ঘুরে বেড়ায় অ-গুন্তি বাচ্চা। তাদের নিয়ে শুরু হল "ছোটদের বাড়ি"। শিক্ষার হাত ধরে হবে মানব কল্যাণ; মানুষের জীবন ভালো হবে শিক্ষার সাহায্যে- এমন বিশ্বাস-ই তীব্র ভাবে জেগে উঠে ছিল মারিয়ার মনে। "ছোটদের বাড়ি" প্রস্তুত হয়েছিল মারিয়ার শিক্ষণ ভাবনায়। প্রচুর শিক্ষণ– সামগ্রী সাজানো থাকত। বস্তির বাচ্চারা আসত, খেলত, ঐ সামগ্রীগুলো নাড়া চাড়া করত আর সেই সঙ্গে চলত শেখা। বাচ্চারা স্বাধীন ভাবে শিখত। মারিয়া বিশ্বাস করতেন শিশুর মন স্পঞ্জের মতো ও জল শুষে নেওয়ার মতো। শিশুমন হলো "বিশোষক"। শেখার পরিবেশ পেলেই সেই মন শেখার উপকরণ খুঁজে নেয়। শিশু সৃষ্টি করতে করতে শেখে। শিশুর মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব আর আত্মবিশ্বাস বিকশিত করতে গেলে প্রয়োজন শিশুর প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা। এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে তারা অবশ্যই শিখতে পারবে। সান লেরেঞ্জোতে এই কাজ শুরু করেন মারিয়া আর তার সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে।

মারিয়ার বৈজ্ঞানিক মন শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তাকে সংগঠিত করে। শিক্ষা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, মারিয়া ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন মারিয়া। সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে এক সুসংগঠিত কাঠামো দেন। মারিয়া মনটেসরির শিক্ষণ পদ্ধতিটি রূপায়িত হয় কিছু প্রামাণ্য শিক্ষণ সামগ্রীর সাহায্যে। উপকরণের সাহায্যে তুলনামূলক ধারণা তৈরি হওয়া। পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে উপকরণ পেরিয়ে বিমূর্ত শেখার দিকে এগিয়ে যাওয়া। শিশুর নির্দিষ্ট আচার আচরণ ও পরিস্থিতি অনুসারে নানান উপকরণ রাখা থাকবে। শিশুদের কাছ থেকে আশা করা হয় যে তারা এই সব উপকরণ ব্যবহার করে নিজেরাই শেখার এক একটা পর্যায় অতিক্রম করবে। আশা করা হয় এই মুক্ত পরিবেশে কাজ করতে করতে শিশু স্বাধীন হতে শিখবে। তাই মন্টেসরি কাছে নিয়মানুবর্তিতা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়ার নয়। ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ম আবিষ্কার করে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ও সেই নিয়মকে অনুসরণ করে- এই আত্ম বা স্বয়ং নির্ভর শিক্ষাচর্চাই মন্টেসরি করে গেছেন। আর যেহেতু মন্টেসরি মানব জীবনে বাল্যকালের গুরুত্ব অনুভব করেন তাই ছোট থেকেই শিশুদের মধ্যে এই স্ব-নিয়মানুবর্তিতার বোধের বীজ বপনের কথা বলেছেন। নানান বাস্তব– নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে ধৈর্য, যথাযথতার বোধ ও চর্চা করার মতো অনুশীলনীর ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন মারিয়া। তিনি বিশ্বাস করেন যে এর ফলে শিশুদের মধ্যে মনঃসংযোগ বাড়ে, বৌদ্ধিক বিকাশ

হয়।

মন্টেসরি শিক্ষাপদ্ধতিতে অক্ষম ও বয়স্কদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা জায়গা পেয়েছে। "ছোটদের বাড়ি"-তে বয়ঃসন্ধির শিশুদের সঙ্গে এই বোধের চর্চা বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হত। মারিয়া মন্টেসরি শিক্ষাভাবনায় জীবন রহস্যের প্রতি এক মুক্তমনা সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়। মাইক্রোস্কোপের লেন্সের ভিতর দিয়ে কোন একটা জৈবিক অংশ দেখতে দেখতে পর্যবেক্ষকের মন নিজের মধ্যে প্রাণের খেলা চলছে তাতেই মেতে ওঠে। তাই মন্টেসরি প্রণীত শিক্ষণ সামগ্রীগুলো এমন হবে যেগুলো তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির হাত ধরে ধরে পড়ুয়াকে বিমূর্ত বোধের দিকে নিয়ে যাবে। এই ভাবে পড়ুয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি তৈরি হবে। শিক্ষণ সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি গঠনে পরিবেশও বড় ভূমিকা পালন করে। মারিয়া মন্টেসরি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের উপর। এই সামর্থ্য ও শিশুর বিশোষক মন উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিকশিত হয়। মন্টেসরির কাছে একজন ব্যক্তির শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার অর্থ হলো পরপর একাধিক বেশ কয়েকটি জন্ম নেওয়ার মতো ঘটনা। এই ক্রমান্বয়ে শিশু থেকে বড় হয়ে ওঠার পথে রয়েছে প্রচুর দূর্বলতা আর অজানা বাঁক। শিক্ষা প্রক্রিয়া ব্যক্তি মানুষের এই বড় হয়ে ওঠার চলাকে সুগম করে। মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষা ভাবনা হলো তত্ত্ব আর চর্চার এক অপূর্ব মিশেল। তাঁর এই তত্ত্ব চর্চার দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর চর্চা ভিত্তি পেয়েছে বৈজ্ঞানিক নীতির সাহায্যে। তাই বোধহয় মারিয়া মন্টেসরির শিক্ষাপদ্ধতি এত সার্বজনীন মান্যতা পেয়েছে, গৃহীত হয়েছে।

(১৮৭২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

শ্রী অরবিন্দ

এম কে রায়না- এর লেখা ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের মূল উপাদান তিনটিঃ

১) ব্যক্তি মানুষ– তার সাধারণত্ব ও তার অনুপম অস্তিত্ব

২) জাতি বা দেশবাসী

৩) বিশ্ব মানবতা। ব্যক্তির শরীরে আর মনে যেমন অন্তরাত্মার বাস, তেমনি অন্তরাত্মা বাস করে দেশ বা জাতির অন্তরে। শ্রী অরবিন্দ এমন এক শিক্ষার কথা ভাবতেন, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি আত্মা ও জাতির আত্মা বিকশিত হবে, অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও শক্তি প্রকটিত হবে। আর তার প্রভাব গিয়ে পড়বে বিশ্বমানবতায়।

শ্রী অরবিন্দ তাই এক পরিপূর্ণতা হলো একটা প্রক্রিয়া। জৈবিক বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত সবধরনের শক্তি ও ক্ষমতা কাজ করে। এবং এই বিকাশের পথে ব্যক্তির স্বভাব ও স্বধর্ম যা একান্ত ভাবে সেই ব্যক্তির আন্তরিক সেগুলির উপর ভিত্তি করেই এই পরিপূর্ণ শিক্ষার পথ এগিয়ে চলে। পরিপূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার কাজ হলো উন্নতির পথ সুগম করা, উন্নতির জন্য সকল সুবিধা, উপায়ের ব্যবস্থা রাখা। পরিপূর্ণ শিক্ষার তিনটি অবশ্য পালনীয় নীতির কথা বলেছেন শ্রী অরবিন্দ।

প্রথমঃ- কিছুই শেখানো যায় না। পড়ুয়া শেখে তার নিজস্ব তাগিদে, নিজের চেষ্টায়। শিক্ষক এখানে সহায়ক ও পথপ্রদর্শকের কাজ করে। যেন একজন বন্ধু। শিক্ষকের কাজ হলো কেমন করে শিখতে হয়, জানতে হয়, তা দেখিয়ে দেওয়া। শেখানোর পথে হুকুম, নির্দেশের কোন স্থান নেই। ছোট শিশুদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এক আবিষ্কারক লুকিয়ে থাকে। শিশু জন্ম সূত্রেই অনুসন্ধিৎসু, বিশ্লেষক। তার মধ্যে প্রকৃতিদত্ত ভাবে দেওয়া থাকে জানার ইচ্ছা, কল্পনাশক্তি। প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিদত্ত এই উপহারগুলো ফুটিয়ে তোলাই শিক্ষকের কাজ। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে শ্রী অরবিন্দ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ ছোট শিশুদের সঙ্গে মাতৃভাষারই যোগ সবচেয়ে বেশি।

দ্বিতীয় নীতি হলোঃ- পড়ুয়াদের উপর জোর করে কোন শেখার "বিষয়" চাপিয়ে দেওয়া হলো বর্বরোচিত কাজ। কী শিখব, কী জানব তাতে পড়ুয়াদের ইচ্ছা– অনিচ্ছা সম্পূর্ণ ভাবে মান্যতা পাবে। শিশুর কোন নির্দিষ্ট গুণ, ক্ষমতা, দক্ষতা উন্নত করা হবে, তাকে কোন পূর্ব-নির্ধারিত বৃত্তি বা পেশার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করানো হবে এবং তার জন্য শিক্ষক, শিক্ষিকা অভিভাবকদের প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন শ্রী

অরবিন্দ। তিনি মনে করতেন শিশুর মধ্যে যে প্রকৃত স্বাভাবিক দক্ষতা ও ক্ষমতা রয়েছে সেগুলিকে প্রাথমিক ভাবে লালন পালন করা দরকার।

তৃতীয় নীতিটি হলোঃ- কাছের পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাওয়া। অর্থাৎ শিক্ষার পথ সরাসরি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নিজের জানা– বোঝা– থেকে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করবে বৃহৎ জগতের দিকে। আরো গভীর আরো উন্নত অভিজ্ঞতার দিকে শিক্ষার পথ এগিয়ে যাবে। শিক্ষার লক্ষ্যই হলো পড়ুয়ার অন্তরে যা আছে, তার ভালোটা বার করে আনা এবং তাকে পরিপূর্ণতা দেওয়া।

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা নীতির রূপায়ণের মাধ্যম হলো পড়ুয়ার অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণের চারটি স্তর। প্রথম স্তরটি হলো চিত্ত। যা আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার। চিত্তের নিষ্ক্রিয় স্মৃতির অংশটি শিক্ষা পদ্ধতির বাইরে থাকে। কিন্তু চিত্তের যে সক্রিয় স্মৃতির বিভাগ তার উপর শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কাজ করে। এই সক্রিয় স্মৃতির অংশটি যথাযথ শিক্ষার সাহায্যে আরও উন্নত হয়ে ওঠে।

অন্তঃকরণের পরের স্তর যা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে যেটি হলো মানস। ভারতীয় মনস্তত্ত্বে এই মানসকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে মনে করা হয়। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা আর ত্বক দ্বারা গৃহীত অনুভূতিগুলি যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয় মানস ইন্দ্রিয় দ্বারা। এই মানস স্তরের উপর শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম। শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আর মানসেন্দ্রিয় যথার্থ ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে এবং শিক্ষার প্রথম ধাপ হিসাবে এই ইন্দ্রিয় শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে যায় আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রশিক্ষণ। যেমন, আমাদের চোখ যা দেখে আর মন যা অনুভব করে তা যথার্থ ভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন আমাদের হাতের প্রশিক্ষণ। সমগ্র অন্তঃকরণে তৃতীয় স্তর যেটি শিক্ষার আওতায় ঢুকে পড়ে, সেটা হল বুদ্ধি। বুদ্ধি নানা ধরণের কাজ করে। কাজ অনুসারে বুদ্ধিকে দুটি দলে ভাগ করা যায়।

ডান দলে কাজ করেঃ- সামগ্রিকতার বোধ, সৃজনশীলতা ও সংশ্লেষ বা সংযোগ সাধনের বোধ। আর বুদ্ধির বাম দলে কাজ করেঃ- বিচার বিশ্লেষণ, তুলনা করার বোধ আর যুক্তি বোধ। বুদ্ধিবৃত্তির দুই ধরণের কাজকে উৎসাহিত করে পরিপূর্ণ শিক্ষা। অন্তঃকরণের চতুর্থ অংশটি অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতা বা শক্তির আধার। খুব সাধারণভাবে এই স্তরটি ক্রিয়াশীল না থাকলেও, মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে সব মানব কীর্তি আজও অজেয় অমর হয়ে রয়েছে, তাতে অন্তঃকরণের অতিমানস স্তরটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুর মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা ও অতি-মানস শক্তিগুলির বিকাশ পরিপূর্ণ শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে।

শ্রী অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা ভাবনায় চার ধরণের শিক্ষার কথা বলেছেন।

১) ইন্দ্রিয় শিক্ষা, যার মধ্যে ঢুকে আছে স্নায়ু সবল সক্ষম করে তোলার প্রশিক্ষণ। সংবেদনশীল ও যথার্থ ভাবে ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয়ের জন্য চাই সবল সক্ষম স্নায়ু।

২) শরীর শিক্ষা, যার আওতায় পড়ে সুন্দর সবল দেহ সৌষ্ঠব গড়ে তোলা।

৩) মনের শিক্ষা, যার প্রধান লক্ষ্য হলো মনঃসংযোগ ও মনোনিবেশের ক্ষমতা বাড়ানো। জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক প্রয়োজন হলো মনোনিবেশ করতে জানা। এখানে যোগ অভ্যাসের চর্চার প্রয়োজন হয়।

৪) নীতি শিক্ষা, এর মূল বিষয় হলো পড়ুয়াদের নীতিবোধের প্রশিক্ষণ, যা তাকে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল-এর বিচার করতে শেখাবে। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন না যে কতগুলো নীতি শিক্ষার বই আর ধর্ম গ্রন্থ পড়িয়ে দিলেই মানুষের মধ্যে শুভ– অশুভ বোধ তৈরি হয়ে যাবে।

তাছাড়া ভালো-মন্দ বোধ বাইরে থেকে নির্দেশ আদেশের মাধ্যমেও শেখানো যায় না। এর সঙ্গে যেহেতু হৃদয় জড়িত তাই হৃদয়কে ছুঁতে গেলে চাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। এর জন্য প্রয়োজন যথার্থ অনুভূতি আবেগের অভ্যাস করা, উদার ও উন্নত পরিমণ্ডলে মেলামেশার সুযোগ, উৎকৃষ্ট মানসিক ও শারীরিক গঠন তৈরি করা। শিক্ষক ও পড়ুয়ার মধ্যে আন্তরিক আদানপ্রদান, একসাথে বইপড়া, কথালাপ - এগুলি পড়ুয়াদের মধ্যে শুভ হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ ঘটাতে পারে। বাইরে থেকে ধর্মীয় শিক্ষা নয়। ঘৃণাকে ভালোবাসায় পরিণত করাই শ্রী অরবিন্দের নীতিশিক্ষার মূল বিষয়। পড়ুয়ার খারাপ সংস্কার বা আচরণগুলোকে চিকিৎসা-যোগ্য রোগ বলে মনে করতে বলেছেন। সঠিক পথে এই বদ অভ্যাস থেকে আরোগ্য লাভ সম্ভব। তার জন্য শাস্তির প্রয়োজন নেই। অপরাধ ভাবার দরকার নেই। শ্রী অরবিন্দের কাছে শিক্ষা হলো এমন এক পথ যে পথ ধরে যেতে যেতে পড়ুয়া তার মানুষ জন্মের লক্ষ্য কী তা জানতে পারে। নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝতে গিয়ে সে জানবে গোটা মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এবং করতে করতে সমাজে তার স্থান আর ভূমিকাকে সে নিজেই নির্ধারণ করে নেবে। এই ভাবে ব্যক্তি চেতনায় বিশ্ব চেতনার উত্তরণ ঘটবে।

১৯৪৩ সালে শ্রী অরবিন্দ পন্ডিচেরির আশ্রমে একটা স্কুল খোলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শের যথার্থ রূপায়ণের লক্ষ্যে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সাধনসঙ্গী– দ্য মাদার। কুড়িজন পড়ুয়া নিয়ে স্কুল শুরু হয়। এই স্কুলের লক্ষ্য ছিল সেই সব মানুষ তৈরি করা, যারা মানব জাতির প্রগতির জন্য, ঐক্যের লক্ষ্যে কাজ করবে। মানবকল্যাণের জন্য যে নব্য মানব শক্তি প্রয়োজন, সেই নতুন শক্তিকে এই পড়ুয়ার দল ধারণ করবে, লালন করবে।

(১৮৯১-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

আন্টোনিও গ্রামসি

আটিলিও মোনাস্টা রচিত ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

আন্টোনিও গ্রামসির জীবনকাল বেশ ছোট। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার জগতে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইতালিতে দেখা দিয়েছিল বিপুল শিল্পায়ন, অর্থনীতির বিকাশ। এই আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন জারি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অব্দি। একদিকে তৈরি হয়েছিল বিজ্ঞান সম্মত কাঠামো আর অপরদিকে গড়ে উঠছিল শিল্পকলা-সংস্কৃতির বিজ্ঞান সম্মত পরিবেশ। যদিও এই উন্নয়নের সুফল দক্ষিণ ইতালির তুলনায় উত্তর ইতালিতে বেশি চোখে পড়ত। গ্রামসি জন্মেছিলেন দক্ষিণ ইতালির সারদিনিয়া প্রদেশে। উচ্চ শিক্ষার্থে এসেছিলেন তুরিন শহরে। তুরিন শহর সেকালের ইতালীয় শিল্পায়নের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। এ শহর ছিল ইতালির শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্র। গ্রামসির রাজনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবিশী শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাংবাদিক ও থিয়েটারের রিপোর্টার হিসেবে। সন্ধ্যে হলেই গ্রামসি চলে যেতেন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মিটিংয়ে। সমাজবাদী পার্টির দপ্তরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হলো; তুরিন শহর সমাজবাদীদের লাল দুর্গ হয়ে উঠল। গ্রামসি এই সময়ে দুটি পত্রিকা প্রকাশনার কাজে হাত দেন। মূল লক্ষ্য ছিল শিল্পায়ন আর যুদ্ধের ফলে জাত শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা। শ্রমের বিজ্ঞান সম্মত পরিচালনার সঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক পরিচালনার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে পত্রিকা দুটিতে লেখালিখি হয়। আসলে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু বছর আগে থেকে ইতালীয় সরকারের শিক্ষানীতিতে এক বিভাজন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। শ্রমের জন্য প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিগত শিক্ষা প্রস্তুতিকে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাক্রমের থেকে আদর্শগত ভাবে আলাদা বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল। গ্রামসির মনে ভিন্ন ধারার মতামত তৈরি হচ্ছিল। গ্রামসির মতে শিক্ষা হলো এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে তত্ত্ব আর চর্চ্চার মেলবন্ধন ঘটে; শিক্ষার পরিসরে সংস্কৃতি অপরিহার্যভাবে মিশে যায় রাজনীতির সঙ্গে। গ্রামসি বরং দেখতে পাচ্ছিলেন এক "নতুন পেশাগত সংস্কৃতি" জন্ম নিতে চলেছে, যার মধ্যে মিশে থাকছে শ্রম আর সংস্কৃতি। শ্রমের সংগঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্কৃতি দুনিয়ার সম্পর্ক দেখতে পেলেন গ্রামসি। মানব সভ্যতার প্রয়োজন সেই জাতীয় প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, যার হাত ধরে তৈরি হবে দক্ষ শ্রমিক থেকে শুরু করে পরিচালকবর্গ,যারা শিল্পায়নকে নিয়ন্ত্রণ

করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমাজকেও উন্নত করে তুলবে, পড়াশোনা– জানাবোঝার হাত ধরে চলবে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতন কাজকর্ম। স্কুল শিক্ষা নিয়ে গ্রামসির কয়েক পাতা লেখা যতটা না শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, তার চাইতে তাঁর ভাবনা-চিন্তায় শিক্ষামূলক ধ্যান-ধারণা তাঁকে আরও বেশি করে শিক্ষাবিদ করে তোলে। শিক্ষা বা শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে কথা বলার চাইতে " শিক্ষা আসলে কী" তার বার্তাই গ্রামসি বেশি করে বলে গেছেন। ১৯২২ থেকে ইতালির রাজনীতিতে ফ্যাসিজমের কামড় শক্ত হয়ে চেপে বসল। ইতালির গণতান্ত্রিক চলনে বাধা তৈরি হতে লাগল। জনগণের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন স্তব্ধ করে দেওয়া হলো। ১৯২৬ 'এ' মুসোলিনি সরকার ইতালির সংসদ ভেঙ্গে দেন। বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গ্রামসি তখন ৩৫ বছর বয়সী তরুণ। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও ইতালিয় সংসদের সদস্য ছিলেন। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

১৯২৮ সাল, গ্রামসির বিচার সভা চলছে। সরকার পক্ষের উকিলের লম্বা ভাষণ এইভাবে শেষ হলোঃ "আগামী কুড়ি বছর এঁর (গ্রামসির) মস্তিষ্ক যাতে কাজ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে"। গ্রামসির মস্তিষ্ক স্তব্ধ করা গেল না। জেলে বসে লিখে ফেললেন ২৮৪৮ পাতার হাতে লেখা নোট। সেটি "প্রিজন নোটবুকস" নামে পরে প্রকাশিত হয়। এতে ধরা আছে শিক্ষা ও রাজনীতি সংক্রান্ত মতামতগুলি। শিক্ষা ও রাজনীতি নিয়ে ইতালির বুদ্ধিজীবিদের ঐতিহাসিক অবস্থান নিয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী চিন্তা-ভাবনা।

গ্রামসির অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠল সমাজে সক্রিয় থাকা বুদ্ধিগত শক্তিগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ। এ শক্তি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও রাজনীতির মিশেল। আমাদের চারপাশে যে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল দেখতে পাই তা সমাজের আধিপত্যকারী শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সমাজে যাদের আধিপত্য সংস্কৃতির দুনিয়া তাদের পচ্ছন্দ-অপচ্ছন্দকেই প্রতিফলিত করে। প্রভাবশালীরাই হচ্ছে চলমান সংস্কৃতি। যে ধরণের সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তার কার্যসিদ্ধির জন্য সে তার প্রয়োজনীয় নানাধরণের বুদ্ধিজীবি তৈরি করে নেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানান ক্ষেত্রের জন্য এই অর্গানিক বুদ্ধিজীবিদের তৈরি করা হয়। ফলে বুদ্ধিজীবির সজ্ঞায় তারা কী কাজ করে-র বদলে তারা সমাজে কোন ভূমিকা পালন করে সেটা গুরুত্ব পায়। এই বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতাশালী দল তাদের প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক "আধিপত্য" বা "কর্তৃত্ব" জারি করে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার "অর্গানিক" বা 'জৈবিক' দল হলো শিল্প প্রতিষ্ঠান ও নানা পরিষেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-ব্যাবস্থাপকেরা, রাষ্ট্রপ্রশাসনের প্রশাসকেরা, আমলাতন্ত্রের পরিষদবর্গ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-অধ্যাপকেরা। এদের মাধ্যমেই ধনতন্ত্র তার শাসন চালায়, কাজ সারে। আর

এক ধরণের বুদ্ধিজীবির দল রয়েছে। যাদের বলা হয় প্রথাগত বুদ্ধিজীবি যেমন – দার্শনিক, বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক-পন্ডিত প্রভৃতি। তাঁরা মনে করেন যে সমাজ- রাজনীতি তাঁদের ছোঁয় না। তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা প্রভাবশালী শক্তির আওতার বাইরে থাকেন। আসলে এঁদের মধ্যে দিয়েও শাসনতন্ত্র তার মতামত কায়েম রাখে।

চলতি সমাজ ব্যবস্থায় অর্গানিক বুদ্ধিজীবিরা নানান ধরণের কাজে নেতৃত্ব দেন, নির্দেশ দেন। প্রথাগত ভাবে কায়িক শ্রম আর বুদ্ধিগত শ্রমের যে ভাগ করা হয় তার পিছনে লুকিয়ে আছে এই 'নির্দেশনার' গল্প। যে কাজ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করায় তা-ই বুদ্ধিজীবির কাজ হয়ে যায়। আর নিম্নপদস্থদের কাজ হয়ে যায় কায়িক পরিশ্রমের কাজ। গ্রামসির নতুন শিক্ষা তত্ত্ব বুদ্ধিগত শ্রম ও কায়িক শ্রমের এই বিভাজনের সমালোচনা করে। সমাজ সংসারে যে শ্রম বা কাজের দুনিয়া চলছে তার আসল রূপ থেকে আমাদের নজর সরিয়ে রাখা হয়। কাজের ধরণ-ধারণ, খুঁটি-নাটি গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রামসির মতে যে কোন ধরণের কায়িক শ্রমের পিছনে, তা যতই নগণ্য ও যন্ত্রবৎ হোক না, অবশ্যভাবে বুদ্ধি কাজ করে। গ্রামসি তাঁর শিক্ষাক্রমে "এক নতুন ধরণের বুদ্ধিজীবি" তৈরির কথা বলেছেন। কারখানার সেকেলে অথবা অদক্ষ স্তরে কাজ করা সত্ত্বেও এই কায়িক শ্রমিকেরাও বিশেষ ধরণের প্রযুক্তি শিক্ষার জাদুবলে বুদ্ধিজীবি বলে গণ্য হবে। সমাজে অর্গানিক বুদ্ধিজীবিদের নেতৃত্ব-নির্দেশনা চলে শিক্ষার হাত ধরে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করে এক ধরণের অনুরূপতা। সমাজে বাস করা মানুষ সেই অনুরূপতায় অভ্যস্ত হয়। তাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় এক ধরণের "সাধারণ বুদ্ধি"। এইভাবে সমাজবাসী মানুষ "অনুরূপ" ভাবে ভাবতে শেখে, বিশ্বাস করে। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জগৎ পারে। তার আছে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ বেছে নেবার শক্তি। জগৎ-জীবনকে সে সচেতনভাবে বুঝে নিতে পারে। নিজের জীবনের নির্দেশক হতে পারে। বাইরে থেকে ঢেলে দেওয়া ছাঁচের প্রতিরোধ করতে পারে। ইতিহাস তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। আর এখানেই কাজ করে গ্রামসি প্রণীত সক্রিয় শিক্ষা। সক্রিয় শিক্ষার কাজ হলো মানুষের সামনে এই বিভিন্ন ধরণের "অনুরূপতা" গুলো তুলে ধরা, ছাঁচে ঢেলে দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলো তুলে ধরা। আর এইখানেই গ্রামসির চিন্তার অভিনবত্ব কাজ করে।

রাজনীতির স্ব-ক্ষমতার অলিন্দ থেকে শুরু করে সমাজে চলতে থাকা অনুরূপতাগুলোকে তাঁর শিক্ষা তত্ত্ব দিয়ে দেখতে পারা। সেই একই তত্ত্ব দিয়ে স্কুল ও পারিবারিক জীবনকে ব্যাখ্যা করতে পারা। গ্রামসির মতে পলিটিক্যাল হেজেমনি বা এক দলের উপর অন্য দলের যে রাজনৈতিক আধিপত্য চালু থাকে তা আসলে এক ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া। শিক্ষার কাজ কি তবে সচেতন করে তোলা? সমাজে যে ক্ষমতা আর আধিপত্যের লড়াই চলছে, সেই লড়াইয়ের পিছনে যে রাজনৈতিক

অবস্থান কাজ করছে তা তুলে ধরা। রাজনীতির অন্দরে যে লুকোনো দিকগুলো রয়েছে তা স্পষ্ট করে তোলা। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে শেখা। ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক প্রভাবকে এড়িয়ে নিজের মত বেছে নেবার স্বাধীনতা তৈরি করা। তিনি তাঁর শিক্ষার কৌশলে "নিরপেক্ষ" ছিলেন না। তিনি সেই দর্শন চর্চ্চার অনুসরণ করার কথা বলেছেন যার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে রাজনীতি ও সংস্কৃতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যায়। মানুষ যেন তার সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সঠিক ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখে। এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবনের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে। যার ফলে তারা নিজেদের সমাজকে নিজেরাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। যারা সমাজের নেতৃত্বে রয়েছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

গ্রামসির শিক্ষাতত্ত্ব ও চর্চ্চার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ-

১) আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে এক শেখা-জানার প্রক্রিয়া। প্রথাগত পদ্ধতি মেনে এই শিক্ষা প্রক্রিয়া চলে না। ফলে, শেখার মুহূর্তগুলিকে বিশেষ নজর দিয়ে দেখতে হয়, বুঝতে হয়।

২) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়– বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র– অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্দরে ঘটে চলে সংস্কৃতি আর রাজনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, যা আমরা দেখতে পাইনা– দেখতে দেওয়া হয় না। সব বিরোধ ঢাকা থাকে আবরণে। তেমনি স্কুল-কলেজের বাইরে যে কাজের দুনিয়া– রাজনীতির জগৎ, তাতেও ঘটে চলেছে এক শিক্ষা প্রক্রিয়া– শেখা-জানার প্রক্রিয়া। এখানকার শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া, স্কুল-কলেজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রক্রিয়ার মতো স্পষ্ট নয়।

৩) স্কুল-বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক কিছু নতুনের প্রবর্তন করতে হবে।

নতুন ভাবনা আনতে হবে পাঠক্রমে, পঠনপাঠন পদ্ধতিতে, পাঠবিন্যাসে। যাতে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ভাবনার প্রশ্ন করার সুযোগ ঘটে। তত্ত্ব ও চর্চ্চার মধ্যে আরো মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। শ্রমের ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে জানতে হবে। আরও আরও তর্ক তুলতে হবে শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষার মূল্যকে ঘিরে। শিক্ষার হাত ধরে তৈরি হবে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। যেখানে সাধারণ মানুষ প্রস্তুত হবে প্রযুক্তিগতভাবে, বৃত্তিগতভাবে। শিল্পোন্নয়নকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। এই সংস্কৃতিবোধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গুরুত্ব পেলেও তাতে থাকবে না "সব মুস্কিল আসানের" ঔদ্ধত্য। আর এ ছাড়াও এই সংস্কৃতিতে রাজনীতি–অর্থনীতি মিলেমিশে থাকবে।

যেসব শিক্ষকেরা পড়ুয়াদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছেন, তাদের কাছে শিক্ষাকে "এক দলের উপর অন্য দলের আধিপত্য"–এর প্রক্রিয়া বা শিক্ষাকে "সামাজিক অনুরূপতা" র প্রক্রিয়া বলে ভেবে নিতে অস্বস্তি বোধ হবে। তবে এই সচেতনতার মাধ্যমে তৈরি হবে শিক্ষকতায় নতুন ধরনের এক পেশাদারীত্ব।

(১৮৯৩-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

মাও জে দঙ

ঝাও কিনজিয়ান রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

বিশ শতকের গোড়ার দিক। সামন্ততান্ত্রিক শাসনে আর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে জর্জরিত চিনের সাধারণ খেটে খাওয়া চাষী, মজুর জনগণ। দারিদ্র আর অ-শিক্ষার অন্ধকারে কাটে তাদের দিন। শিক্ষা ব্যবস্থার মাথায় চড়ে রয়েছে ধনী, অভিজাত আর আমলা। তাই শিক্ষার সুযোগ এসে পৌঁছায় না গ্রামের ছোট ছোট কৃষকের ঘরে। চিন দেশের হুনান প্রদেশের এক কৃষক পরিবারে বেড়ে ওঠে এক 'তরুণ তুর্কী'। চোখে তার দিন বদলের স্বপ্ন।

যুক্তিবাদী মন স্বপ্ন দেখে এক আর্দশ সমাজের যার শাসনভার থাকবে সর্বহারা শ্রেণীর হাতে – যারা মাঠে চাষ করে, কারখানা আর খামারে মজুর খাটে। শুধু স্বপ্ন দেখে ক্ষান্ত থাকেন না মাও জে দঙ। হাতে নাতে কাজ করতে নেমে পড়েন শিক্ষাকে হাতিয়ার করে। ১৯১৭-২৭ এই সময় জুড়ে মাও এর নেতৃত্বে তৈরি হয় শ্রমিক, কৃষকদের জন্য নাইট স্কুল। এইভাবে নাইট স্কুল বসে হুনান, চানেসার গ্রামে, গঞ্জে কারখানার পাশে। মাও এর নেতৃত্বে কৃষকেরা জোট বাঁধে, তৈরি হয় কৃষক সংগঠন। কৃষক সংগঠন কেন্দ্রগুলিতে পড়াশোনা শুরু হয়। সেখানে মাও পড়াতে আসেন কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, ভূগোল। মাও নিজে ছিলেন একজন প্রাইমারি স্কুল টিচার। শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী, অভিজাত আমলাদের দখল চূর্ণ করতে হবে। তাই চারদিকে দরকার স্কুল। গ্রামে, গ্রামে, হাটে বাটে, কারখানার পাশে, বসবে জনগণের স্কুল। নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হবে পাঠক্রম। মোটা মোটা বই, সিলেবাস আর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার বদল ঘটাতে হবে। প্রাথমিকভাবে মাও এর শিক্ষা আন্দোলনের পিছনে কাজ করেছিল উদারনীতি, গণতন্ত্রী সংস্কার আর ইউটোপিয়ান (কাল্পনিক স্বপ্নরাজ্য) সমাজতন্ত্রী ধারণা। ১৯২০ সালে তিনি মার্কস- এঙ্গেলস- লেনিনের লেখা পত্রের সংস্পর্শে আসেন। প্রভাবিত হন কমিউনিস্ট ভাবধারায়। ১৯২১ সালে তৈরি করলেন হুনান মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে বিশেষ কোন যোগ্যতা লাগে না। ভর্ত্তি খরচও আপামর মানুষের আওতায় পড়ে। এখানে নেই কোন অযৌক্তিক নিয়মকানুনের নিষেধাজ্ঞা। পাঠক্রমে মিলে মিশে গেল চিনের প্রাচীন ঐতিহ্য আর আধুনিক শিক্ষার বিষয়গুলি। সাধারণ খেটে- খাওয়া মানুষদের সুযোগ হলো এরকম এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার।

১৯২৯-৩৭ চিন জুড়ে শুরু হলো কৃষক আন্দোলন। ততদিনে মাও জে দঙ চিনের

কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি পদ গ্রহণ করেছেন। কৃষক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা মুখ্য হয়ে ওঠে। মাঠে- ঘাটে, ক্ষেতে- খামারে বিপ্লব সংগঠিত করতে পথে নামলেন মাও। কিন্তু শিক্ষা তার সঙ্গ ছাড়ল না। জন বিপ্লবে যোগদান করার ফলে শিক্ষার রণাঙ্গনে কমিউনিস্ট পার্টির দখল সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। মাও জে দঙ লাল ফৌজের আকাদেমিতে পড়াতে যেতেন। সেনানী আর অফিসারদের সমর শিক্ষার সঙ্গে প্রশিক্ষণ দিতেন রাজনীতি বিষয়ে, চিনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ে। ১৯২৭ এর পর চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি এক স্বাধীন বৈপ্লবিক ঘাঁটি কায়েম করতে সফল হয়। গণতন্ত্রকামী শ্রমিক কৃষকদের মুক্তাঞ্চল তৈরি হয় দিকে দিকে। আর মাও জে দঙ -এর চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে চিনের প্রান্তরে প্রান্তরে।

১৯৩৭-৪৯ চিনে শুরু হলো জাপান বিরোধী মুক্তি যুদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টি এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে অংশ নেয়। মাও জে দঙ এই লড়াইয়ের ময়দানে গেলেন সঙ্গে নিয়ে চললেন শিক্ষা-আন্দোলন। বিপ্লবের ঘাঁটিগুলোতে চলল তাঁর ক্লাস নেওয়া। চিন-জাপান সীমান্ত অঞ্চলে গজিয়ে উঠল অসংখ্য প্রাইমারি স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল। জনগণই সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। মাও প্রতিষ্ঠা করলেন মহিলাদের জন্য কলেজ এবং লাল ফৌজের সদস্যদের প্রশিক্ষণ সংস্থা। তৈরি করলেন ডঃ নর্মান বেথুনের নামাঙ্কিত ডাক্তারি কলেজ। ল্যু সুনের নামাঙ্কিত আর্ট ইন্সটিটিউট, প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠ কেন্দ্র, জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মাও তৈরি করলেন মার্কস-লেনিনি পাঠকেন্দ্র। পার্টি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এর মধ্যে অনেকগুলি সংস্থাতে মাও নিজেই পড়াতে যেতেন। আর এত বড় মহাযজ্ঞ যখন চলছে তখন চিনের মাটিতে গড়ে উঠছে নতুন এক ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের হাত ধরে গড়ে উঠছে নতুন সমাজ।

শিক্ষা জগতে নিজে নিজে হাতে–কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং বিপ্লবের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ মাও জে দঙের শিক্ষাসংক্রান্ত মতবাদ সুদৃঢ় করেছিল। মার্কসীয় চিন্তার প্রভাব সেই ভাবনাকে আরও উর্বর করে তোলে। ইতিহাসকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ব্যাখা করতে শেখেন।

১৯৪৯– এ তৈরি হলো নতুন চিন। সেখানে মাও জে দঙ-এর শিক্ষাচিন্তা-ই বজায় থাকে। নতুন চিনের স্কুলগুলিতে তিনি নিয়মিত পরিদর্শনে যেতেন, শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা যেন নতুন দিগন্তে উড়ান দেয়। শিক্ষা নিয়ে মাও জে দঙের মূল বক্তব্যগুলি ও ভাবনাগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক-

১) মাওয়ের মতে ১৯১৯- এ চিনের মাটিতে যে গৃহযুদ্ধ হয়, যেখানে পুরানো পন্থী সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে বিরোধ লাগে আধুনিক মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর। এখানে লড়াইটা হয় পুরানোপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার। যুদ্ধের ফলে তৈরি হয় নব-গণতন্ত্র। আর নতুন গণতন্ত্রে শিক্ষাই মূল বিষয় হয়ে ওঠে ।

২) শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি আর অর্থনীতির গভীর যোগ বজায় থাকে। অর্থনীতির

ভিতে রাজনীতি বেড়ে ওঠে, প্রকটিত হয়। মাও চাইতেন চিনের সংস্কৃতিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের হাত থেকে মুক্ত করতে, তার কারণ এর সাথে সাধারণ মানুষ, কৃষক– চাষীর কোন যোগ ছিল না। তাঁর আশা চিনের মাটিতে দেখা দেবে কৃষক অভ্যুত্থান। ভূস্বামীদের ক্ষমতাচ্যুত করার ফলে কৃষকদের মধ্যে শুরু হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। গ্রামে গঞ্জে গজিয়ে উঠবে অসংখ্য স্কুল। গ্রামের মানুষ সেই স্কুল গড়বে। স্কুলে কি পড়া হবে তা ঠিক করবে সাধারণ মানুষ। পাঠক্রমের সঙ্গে থাকবে মানুষের নাড়ির যোগ।

৩) শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে খেটে খাওয়া মানুষকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের ধ্যান ধারণার বীজ বপন করা। জনশিক্ষার সঙ্গে জনবিপ্লবের যোগ থাকবে। পড়াশোনার সঙ্গে যোগ থাকবে শ্রমের।

৪) তত্ত্ব আর চর্চ্চার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে যোগ। তত্ত্বের জন্য তত্ত্ব নয়। বই – মুখী শিক্ষাপাঠ্যে তা আটকে থাকবে না, তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। বইয়ের মধ্যে আটকে থাকা জ্ঞান যদি সমাজ জীবনে প্রয়োগ করা না হয় তবে সেই জ্ঞান সম্পূর্ণতা পাবে না।

৫) শিক্ষা ও উৎপাদন হাত ধরাধরি করে চলবে। স্কুল প্রাঙ্গণে ঘটবে বড় মাপের উৎপাদন। শিক্ষিত তরুণ দল একযোগে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে কাজ করবে। কাজ, পড়াশোনা ও উৎপাদন একযোগে চলবে।

৬) যুবদের মধ্যে দৃঢ় অথচ সঠিক রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবে শিক্ষা ব্যবস্থা। কায়েমী স্বার্থকে অস্বীকার করে তারা যেন মানুষকে মুক্তির জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে।

৭) বুদ্ধিজীবি, লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, শিল্পকলাকুশলী, ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও বিপ্লবের শরিক করতে হবে। চিনের বিপ্লবের পথে তারাই ছিল প্রথম পথিক। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদের একযোগে কাজ করতে হবে।

৮) যে কোন ধরণের শিক্ষামূলক কর্মসূচী যেন জনগণকে মনে রেখে রূপায়িত হয়। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, মানুষ কী চাইছে আর তারা কী করতে চায় তাই- ই যেন শিক্ষাব্যবস্থায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়। মাও জে দঙ চেয়েছিলেন স্কুল পাঠক্রমে সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপ, স্কুল পরিচালনায় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। চিনে জন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মাও জে দঙের কাজ থেমে থাকেনি। থেমে থাকেনি তাঁর শিক্ষা ভাবনা। এবার কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ফলে বদলে ফেলতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন সমাজবাদী শিক্ষাক্রম আর সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

এরপর তৈরি হয় মাও জে দঙের শিক্ষা সংক্রান্ত আরও লেখা-

১) শিক্ষাকে ব্যবহার করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে সমবায়গুলিকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে হবে। আর্থ– সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার যোগকে পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে।

২) শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজবাদী চিন্তাকে সক্রিয়ভাবে একসাথে লাগু করা। তাই স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে গড়ে দিতে হবেঃ নৈতিক, বুদ্ধি, শারীরিক বিকাশ। তারা যেন সমাজবাদী হয়ে ওঠে। সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। স্বাস্থ্য গঠন অগ্রাধিকার পাবে। পড়াশোনার চাপে যেন তারা অসুস্থ না হয়। পরীক্ষার দানব যেন পড়ুয়াদের ঘাড়ে না বসে।

৩) শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনমুখী শ্রমের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। প্রত্যেকটি স্কুলে উৎপাদনমুখী শ্রম পাঠ্যবিষয় হবে। স্কুল চলবে খামার, কারখানার ধাঁচে। আর কারখানা, কৃষি সমবায় কেন্দ্রগুলি স্কুলের চলন গ্রহণ করবে।

৪) জনশিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটাতে গেলে স্থানীয় কমিটি আর ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুল চালাতে হবে। শিক্ষা সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসবে কারখানা, সমবায়। তৈরি হবে বিভিন্ন ধরণের স্কুলঃ- পূর্ণ সময়ের স্কুল, অর্ধ–সময়ের স্কুল, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাধীন মুক্তপাঠ কেন্দ্র, রেডিও ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম (করেসপন্ডেস শিক্ষা), বিনামূল্যে শিক্ষা ও মুল্যের বিনিময়ে শিক্ষাক্রম। "শতফুল বিকশিত হোক – শতমতবাদ প্রতিযোগিতা করুক"– এমনটাই চেয়েছেন মাও জে দঙ।

৫) অন্যান্য দেশ বা রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে চিন শিক্ষা নেবে। তাদের নানান সফলতা– বিফলতার খবর চিনের কাছে থাকবে। নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিন বুঝে– জেনে নেবে অন্যান্য দেশের উত্থানঃ- রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, সাহিত্য কিংবা শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে।

৬) কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দেশকে পথ দেখানো। মাও নিজে সক্রিয় অংশ নিতেন। প্রতিটি জেলা, রাজ্য, স্থানীয় স্তরের পার্টি কমিটির প্রথম সচিবও একইভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে অংশ গ্রহণ করবেন।

৭) শিক্ষা–কর্মী, শিক্ষাবিদ হয়ে উঠতে গেলে নিজেকে শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। তাদেরকে শিখতে হবে কৃষক, মজুরদের কাছ থেকে। বুদ্ধিজীবিরা হবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বন্ধু। বই–য়ে পড়া বিষয়গুলো মাঠে ঘাটে কাজ করে পরখ করে নিতে হবে। মার্কসীয় তত্ত্বের বেলায়ও তাই হতে হবে। শ্রেণী সংগ্রাম আর কৃষক– মজুরের জীবনের শিক্ষা থেকে মার্কসীয় তত্ত্বকে বুঝে নিতে হবে।

নানান ভুল, ভ্রান্তি, বিচ্যুতির পরেও মাও জে দঙের শিক্ষা দর্শন আজও চিনের শিক্ষার ইতিহাসে একটি মস্ত বড় অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

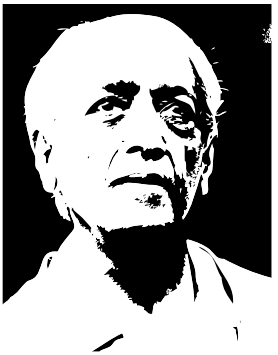

(১৮৯৫-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

জে. কৃষ্ণমূর্তি

মীনাক্ষী থাপান-এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এমন স্কুলও হয়- যেখানে বিকেলের সূর্য দেখতে দেখতে ক্লাস চলছে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আর ঋতুর সঙ্গে বদলে যাওয়া গাছের পাতার রঙ দেখতে দেখতে পাঠের কাজ চলছে। পৃথিবীর মাটিকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ চলছে। রোম্যান্টিক প্রকৃতিবিদের পর্যবেক্ষণ নয়– পৃথিবী– প্রকৃতিকে জড়িয়ে যে সামগ্রিক জীবনপ্রবাহ চলছে সেই ধারাটাকে দেখে – শুনে – বুঝে নেওয়ার চেষ্টাই এই স্কুলের পাঠক্রম। কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশন ইণ্ডিয়া (কে. এফ. আই.) পরিচালিত স্কুলগুলির পাঠ্যক্রম এমনই। বইপত্র সর্বস্ব জানা সব নয়। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির দেওয়া-নেওয়া আর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে শেখায় শিক্ষা।

জে ডি কৃষ্ণমূর্তি দার্শনিক ছিলেন কিন্তু প্রথাগত অর্থে শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না। বাবার প্রভাবে তাঁর যৌবনের অনেকগুলো দিন এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কেটে যায়। মাদ্রাজের (এখন অন্ধ্রপ্রদেশ) থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি। সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন– মন প্রাণ দিব্যজ্ঞানে ভরে থাকত। তবে সেটা একটা বয়স অবধি। থিওসোফিক্যাল সোসাইটির আশা ছিল কৃষ্ণমূর্তি "বিশ্ব-শিক্ষক" বা "সত্যের শিক্ষক" হয়ে উঠবেন। তাঁকে মাথায় রেখে তৈরি হল বিশেষ এক সম্প্রদায়। কৃষ্ণমূর্তি প্রশিক্ষণ পেতে থাকলেন যাতে বিশ্ব-গুরুর পদে আসীন হতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলনের শেষে যে জে. ডি. কৃষ্ণমূর্তি তৈরি হলেন তাঁকে থিওসোফিক্যাল সোসাইটি মোটেও তেমনটি আশা করেনি।

১৯২৯ এর এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি যে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন সেই সম্প্রদায়টিকে ভেঙে দেন। নিজেকে সবরকম কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ, আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত ঘোষণা করেন। আর তাঁর চিন্তা ভাবনা জুড়ে থাকে "সু-সমাজ"– এর খোঁজ, যার ভিত্তি হবে "যথার্থ মূল্যবোধ" আর "যথার্থ সম্পর্কের বন্ধন"।

তাঁর মুক্ত ভাবনা তাঁকে মুক্ত করলো গুরু-নির্দেশিত পথ থেকে। জীবন মানে তাঁর কাছে অন্তহীন পথে হেঁটে চলা– একা। সে পথে জানাবোঝা-ই সঙ্গী। এপথে কোন গুরু/ শিক্ষকের পথ নির্দেশ লাগে না। এপথের পাথেয় মুক্তমন। যে মন দেখবে, লক্ষ্য করবে ও শিখবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে করতেই এই জানাবোঝার পথ চলা , আর প্রতিটি ব্যক্তির এই আত্ম-আবিষ্কার আর তার বাইরের পৃথিবী-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমন্বয় রেখে চলবে। বাইরের আর অন্তরের সমন্বয় সাধন প্রতিফলিত হবে

পরিবেশে, সমাজে। ব্যক্তির সৌন্দর্য, শুভবোধ ছড়িয়ে পড়বে পরিবেশে, সমাজে। তৈরি হবে সু-সমাজ। আর এই অন্তরের পরিবর্তন ও নবীকরণের মূলে থাকবে শিক্ষা। এই শিক্ষাই হয়ে উঠবে সমাজ বদলের হাতিয়ার।

তাই কৃষ্ণমূর্তি বাতিল করেছেন সেই শিক্ষাকে যেখানে "আগে পাঠ করতে হয় পরে কাজে করে দেখাতে হয়"। শিক্ষা তার কাছে ভাগ করে নেওয়ার, অংশ নেওয়ার। শিক্ষাকে দান করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।

আজকের এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাজে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণমূর্তি জোর গলায় বলেন "তুমি প্রতিযোগিতায় অংশ নিও না। ইঁদুর দৌড়ের চূর্ণ– দাগে পা রেখো না যদি তুমি অনাবিল আনন্দের ভাগীদার হতে চাও"।

আবাস্তব লাগছে! কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশনের স্কুলগুলিতে প্রতিযোগিতার লেশমাত্র নেই। এই স্কুলগুলির পাঠক্রম ছাত্র-শিক্ষকের "বিকাশে" বিশ্বাস করে। স্কুলগুলি উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে প্রকৃতির রস-রূপ-গন্ধকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে। বই-মুখী বিদ্যা এখানে চলে না। রেজাল্ট ভালো করার রেশারেশি নেই। নতুন নতুন তথ্য আর তত্ত্ব মিলে কিছু বিষয়ে দক্ষ মানুষ তৈরি করা এই স্কুলগুলির লক্ষ্য নয়। স্কুলগুলির পাঠক্রম দাবি করে– উত্তম আচরণ, ভালো ব্যবহার– কাজ ও সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "আত্ম-বিশ্বাস" ধারণাটির জায়গা ছিল না। তাই তাঁর চিন্তা ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে সব রকমের আত্ম বা অহংকে হটিয়ে দিয়ে বিশ্বাস-আস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। আমাদের চেনা জানা স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও বিচার প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একধরণের তুলনা। যার ফলে ক্লাস ঘরে থাকে দ্বন্দ্ব, ভীতি, অসহায়তা। কৃষ্ণমূর্তির ফাউণ্ডেশন স্কুলগুলিতে শিক্ষকেরা এই তুলনা আর প্রতিযোগী আবহাওয়া বন্ধ রাখতে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকেন। কৃষ্ণমূর্তির কাছে যথার্থ শিক্ষার (যা সু-সমাজের জন্ম দেবে) ভূমিকা হলো ব্যক্তিকে তার চারপাশের সব কিছুর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা। শিক্ষার ভূমিকা অংক-ভূগোলে পারদর্শীতা তৈরি করা নয় বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা নয়। শিক্ষার কাজ একজন যথার্থ মানুষ তৈরি করা, যে বিশেষজ্ঞ হবে না। শিক্ষিত হয়ে সে হয়ে উঠবে এক সার্বিক সত্তা। শিক্ষিত মন ভাববে, চিন্তা করবে, সক্রিয় থাকবে– জীবন্ত–প্রাণবন্ত থাকবে।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ হলো সম্পর্কিত থাকা– সম্পর্কে থাকা"। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক– মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির। এর মূল কারণ প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত– আলাদা নয়। কৃষ্ণমূর্তি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিচেতনার বদলে সমবেত চেতনায়।

আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা চিন্তা কোথায় স্থান পেয়েছে বা পাবে?

আমাদের সামনে কী রয়েছে? রয়েছে ভারতীয় শিক্ষানীতি– যাতে জায়গা পেয়েছে সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো চিন্তা ভাবনা। শিক্ষানীতিতে স্থান পেয়েছে শিক্ষার প্রভাব পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানান উদ্যোগের কথা– সরকারি প্রচেষ্টায় সর্ব সাধারণের জন্য আবশ্যিক শিক্ষাক্রম, কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা, প্রাথমিক– মাধ্যমিক - উচ্চস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শিক্ষানীতির কথা–ভাষা– ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার বিপুল ফারাক। চারদিকে শিক্ষার ব্যর্থতা। শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা জোগাড়ের যোগ নেই, তাই শিক্ষিত হয়ে কাজ জোগাড় করা যায় না। সাক্ষর শিক্ষিত মানুষ তার পরিবারের জন্য স্বচ্ছলতা এনে দিতে পারছেন না– পারছেন না মানসিক সহায়তা এনে দিতে।

চারদিকে এক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এটা কী আমাদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দান নয় ? কোথাও কী শিক্ষার মর্মার্থ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে?

কৃষ্ণমূর্তির দর্শন স্থান পেয়েছে আমাদের দেশের প্রথাগত স্কুলের পরিবেশ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে। কে এফ আই স্কুলগুলির পরিবেশ বিদ্যায় পরিবেশ–প্রকৃতির নবীকরণ জায়গা করে নেয়। পরিবেশবিদ্যার পাঠক্রমে এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার সাহায্যে স্কুল সংলগ্ন স্থানীয় কমিউনিটি পরিষেবা পায়। ফলে কমিউনিটির সঙ্গে স্কুলগুলির সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এই কমিউনিটির পরিবেশ বিস্তার ঘটে, আরো বড় মাত্রা পেয়ে যায়। আমাদের দেশের কিছু বোর্ড (যেমন আই. সি. এস. ই.) কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশনের পরিবেশবিদ্যার বিষয়টি গ্রহণ করেছে।

কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশন পরিচালিত কয়েকটি স্কুল চেন্নাই, মুম্বাই, পুনা ও উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। চেন্নাইয়ের কাছে মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূর্তির জন্মস্থানে) সংলগ্ন উন্মুক্ত মনোরম পরিবেশে তৈরি হয় ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টার, কে এফ আই পরিচালিত প্রথম স্কুল।

ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টারের অন্তগর্ত রুরাল এডুকেশন সেন্টারটি, মাদানাপল্লীর আশেপাশের গ্রামগুলিতে তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে। এর সাহায্যে পাশাপাশি বহু গ্রামে গুণগত মানের প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে গেছে। তৈরি হয়েছে দুটি "হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য" বহুস্তরীয় স্কুল। ১৬টি বহুস্তরীর ছোট ছোট স্কুল, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাস্তবের শ্রীহীন প্রাথমিক স্কুল যেখানে ঘুপচি ঘরে, একঘেয়ে সুরে একক শিক্ষক একপাল বাচ্চাকে নিয়ে ক্লাস করেন। সেখানে ছাত্র অনুপস্থিতি ভীষণ সমস্যা, অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগের অভাব। অর্থ নেই, শৌচালয়হীন, পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই। এই পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঋষি ভ্যালির রুরাল এডুকেশন সেন্টার তৈরি করেছে "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্প। এই ব্যবস্থায় রয়েছে নিজে নিজে শিখে ফেলা যাবে এমন

উপকরণ। উচ্চমানের অথচ ছাত্র-বন্ধু, ছাত্র-উপযোগী, চেনা-জানা বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরি শেখার উপকরণ সঙ্গে থাকছে কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগকারী বিষয়। এই "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। সরকারি, প্রথা-বহির্ভূত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থাগুলি রুরাল এডুকেশন সেন্টারের এই প্রকল্প থেকে সাহায্য নিচ্ছে।

NCERT তাদের ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়টি যোগ করেছেন। যেখানে স্থান পেয়েছে– নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রমী, পরিষেবা ও কর্তব্যবোধ, সাম্যতা, সহযোগিতা ও সত্যতার মত মূল্যবোধগুলি। আশা করা হচ্ছে স্কুল পাঠক্রমের মাধ্যমে ক্লাসঘরে ছড়িয়ে পড়া এই বোধগুলি লড়বে সমাজ জুড়ে গেঁড়ে বসা অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, হিংসা, কুসংস্কার ও দুর্দশাগ্রস্ততার বিরুদ্ধে। আমাদের দেখতে হবে বোধগুলো কি উপর থেকে "বাণীর" মতো চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি বোধগুলো সৃষ্টি হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে! এখানেই প্রয়োজন কৃষ্ণমূর্তির যথার্থ শিক্ষা ধারণার, যে শিক্ষা রূপান্তরকামী। আমাদের শিক্ষানীতি সেই রূপান্তরকামী যথার্থ শিক্ষাকে প্রতিফলিত করবে তো ?

"সত্যকার শিক্ষা মানে কতকগুলো তথ্য মুখস্ত করে পরীক্ষার প্রাচীরটা পেরালাম এমন নয়, এর অর্থ জীবনের তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা ।"- জে.কৃষ্ণমূর্তি

(১৯০৭ -১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)

জে.পি.নাইক

এ.আর.কামাত এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ভারতীয় শিক্ষা জগতে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন জে.পি. নাইক– চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে শিক্ষাদর্শে গান্ধীবাদী মনোভাব; গ্রামে গঞ্জে বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে কাজ কর্ম; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা-পরিচালনা করা; পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠন ও সংস্কার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, রূপায়ণ করাই ছিল জে পি.নাইকের জীবন ধারা। ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কিছু ছিল না যা তাঁর অজানা ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। যেমন– (NCERT) এন.সি.ই.আর.টি (শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় পর্ষদ), জওহারলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালন সংস্থা এন.আই.ই.পি. (N.I.E.P), পুনের I.I.T যেখানে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন নিয়ে পড়াশোনার জন্য কোলাপুরে একটি সংস্থা তৈরি করেন জে.পি.নাইক। ১৯৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। জে.পি.নাইক এই কমিশনের সদস্য-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ধরা রয়েছে তাঁর নানা লেখায়। যেমন-

১) দুই খণ্ডের আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাস, যেখানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কালানুক্রম ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেওয়া আছে।
২) গান্ধীজির বুনিয়াদ শিক্ষা ও তার রূপায়ণ নিয়ে লেখা, যেখানে কর্মশিক্ষা ও হালের SUPW (সামাজিক ভাবে উপযোগী উৎপাদনমূলক কাজ) এর কথা বলা আছে;
৩) জনশিক্ষা সংক্রান্ত নানা লেখা যেখানে বুনিয়াদি শিক্ষার সর্বজনীনতার প্রবর্তন করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। বয়স্ক শিক্ষা, প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষা ও অবিরাম বা কনটিনুয়িং শিক্ষাক্রমের কথা বলেছেন;
৪) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনা নিয়ে বহু লেখা রয়েছে।
৫) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আকারে লেখা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠনের লক্ষ্যে এক মহান নকশার অবতারণা করা।

জীবনের শেষদিকে তাঁর লেখালেখির বিষয় হয়ে ওঠে সমাজ ও শিক্ষার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক। ততদিনে তাঁর ভাবনা চিন্তায় ঘটে গেছে এক বিপুল বদল। শুরুর দিকে

তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষাক্রম আর তাঁর নিজের গ্রামেগঞ্জে গরীবগুর্বো মানুষদের সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। সেই প্রভাব আমরা দেখতে পাই জে পি নাইকের নানা লেখায়, এমনকি ১৯৬৪-৬৬ র শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও সেই প্রভাব দেখা যায়। তিনি জনশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে দাবি করেছেন বুনিয়াদি শিক্ষার সর্বজনীনতাকে (নিদেন পক্ষে ৬-১১ বছর বয়সীদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের কথা বলেছেন)। সর্বজনীন স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি চালু করতে হবে এমন এক প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষাব্যবস্থা যার বহুমুখী প্রবেশ থাকবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা হবে আংশিক সময়ের জন্য। এখানকার পাঠক্রম ক্রমানুসারী হবে না। তত্ত্বগতভাবে এত নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সময় সফল হলো না। ধুমধাম করে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর সূচনা হলেও কিছুদিন পর থেকে কর্মসূচীর পথ চলা খোঁড়াতে শুরু করল। জে পি.নাইক বিরক্তির সঙ্গে এর সমালোচনা করলেন। তিনি এই বলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তিরষ্কার করলেন যে এ ব্যবস্থা চিরকালই "শ্রেণী" শিক্ষার পক্ষে কাজ করেছে। কোনদিনই এই ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে দাঁড়ায়নি। তিনি সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা আর বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যে এক জনআন্দোলনের আহ্বান জানালেন। ভারতীয় আর্থ-সামাজিক গঠনের নিদারুণ দারিদ্র, উপার্জনের ক্ষেত্রে যে ভয়ানক অসাম্য, ধন ও রাজনৌতিক ক্ষমতার অসম বিন্যাস জে পি নাইকের স্বপ্ন সাকার হতে দিল না। তবে তাঁর উদ্যোগে পুনের শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ সংস্থার হাত ধরে গ্রামীণ এলাকায় বেশ কিছু সফল বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা সম্ভব হয়। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি সকল স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় গুণগত উন্নতির ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। আর এই সুবাদে N..I.E.P.A (জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরিচালনা কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। ভারতীয় শিক্ষার পুর্নগঠন , শিক্ষার সঙ্গে সমাজের যোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক জে পি নাইককে ভাবিয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে তাঁর এই চিন্তা ভাবনার কথা জানা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালীন তো বটেই এবং তার পরেও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যে স্বায়ত্ত লাভ করেনি সেটা জে পি নাইক বারবার দেখিয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোল নলচে বদলে ফেলে তৈরি করতে হবে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যা ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন সাধন করবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য সাধন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা ও আধুনিকতার প্রসার ঘটানো, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার এবং যথাযথ সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রসার। উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে মাথায় রেখে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মাধ্যমে পেশ করা হোল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক মহতী নকশা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্ত্তী পশ্চিমী সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারা অনুসারে জে পি নাইকও মনে করতেন যে

শিক্ষা হলো সমাজ বদলের হাতিয়ার। ভারতীয় সমাজে আমূল পরিবর্তন শিক্ষার হাত ধরে আসবে। জে পি নাইক এই মতই পোষণ করতেন। আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে এই মত তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। শিক্ষার মোড়কে একত্রিত হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান আর আধুনিক সময়ের প্রগতি। জে পি নাইকের এই ধারণা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেওয়া জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মহতী নকশা উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অভাবে রূপায়ন করা সম্ভব হলো না। ৭০ দশকের মাঝ সময় থেকে জে পি নাইকের শিক্ষা-সমাজ সম্পর্ক সম্বন্ধে মত বদলাতে শুরু করল। তাঁর লেখায় ক্রমশ ধরা দিতে লাগল অন্য ধারার মতামতঃ–

১) শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে যুগপৎ পুর্নবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

২) পুর্নবিন্যাসের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

কিছু বছর পর সমাজ ও শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর ধারণা আরো তিক্ষ্ণ, ধারালো হতে শুরু করল। সারা ভারত সহ বিশ্বজুড়ে শিক্ষার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে এসেছে। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অচল-অনড় স্থিরতা। জে পি নাইকের লেখায় প্রকাশ পেল "এক নতুন সমাজের দিগ্‌দর্শন"। তিনি ভারতীয় শিক্ষায় রাজনৈতিক বিষয়সূচী ঢোকালেন। গান্ধীবাদী ধারণা থেকে সরে না এসেও, বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার মূল্যবোধের কাছে মেলাবার চেষ্টা করলেও, জে পি নাইকের ভাবনায় স্থান পেল মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সমতা। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে দেশের দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ। আর শিক্ষা ব্যবস্থা বাইরে থাকা রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মীদের কাজ হবে এই দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংগঠিত করার। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রির্সাচের (I..C.S.S.R) সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে, সমাজবিজ্ঞান চর্চা, গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে গিয়ে জে পি নাইকের শিক্ষা ভাবনা এই দিশা পায়। জীবনের শেষ লেখায় তিনি শিক্ষা কমিশনে দেওয়া নিজের তত্ত্বের সমালোচনা করে গেছেন। তিনি কবুল করেছেন যে ওই তত্ত্বে দরিদ্র-নিপীড়িত ভারতের কথা ভাবা হয়নি। ভারতের সমাজে ধন বন্টন, ক্ষমতা বন্টন, উপার্জনের ভয়ানক অসমতা জায়গা পায় নি। ভারতের মতো দেশে সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা যে প্রধান স্থান পেতে পারে না সেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-কাজ যে জায়গা করে নেবে– তা তিনি স্বীকার করে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা জে পি নাইকের একক অবদান কোনদিনই ভুলবে না। যে সময়ে এ দেশের শিক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার মান তুচ্ছাতুচ্ছ, কেবলমাত্র অনুকরণের বিষয় হয়ে তা আটকে ছিল, সেখানে জে পি নাইকের চিন্তা ভাবনা নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। বহু গবেষককে নতুন নতুন কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতের মুখপাত্র হয়ে তথা তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র হয়ে জে পি নাইক পৌঁছে গিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। তাঁর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে।

(১৯১০-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

ম্যালকম আদিসেশিইয়া

এরিক প্রভাকর রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

কথায় বলে, যে যেমন, সে তেমন চোখেই পৃথিবীকে দেখে। ম্যালকম আদিসেশিইয়া ছিলেন একজন উঠতি অর্থনীতিবিদ, তাও আবার এমন সময় যখন তার দেশ ভারতবর্ষ সবে ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে বেরিয়েছে। চাহিদা-জোগান, ক্রেতা-লগ্নিকারি, লাভ-উৎপাদন-উন্নয়নের চুলচেরা বিচার করেছেন অর্থশাস্ত্রের হাত ধরে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছেন, দারিদ্র ঘোচানোর স্বপ্ন দেখেছেন আদিসেশিইয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই যে কেবল অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে দারিদ্র দূরীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, এই ভাবনাও তখন থেকেই দানা বাধঁছিল তাঁর মনে। আর শিক্ষা ক্ষেত্রও যে লাভজনক বিনিয়োগের একটা উপায় সে কথাও মাথায় চাড়া দিচ্ছিল। দেশ জুড়ে শিল্পায়নকে সুস্থায়ী করতে গিয়ে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে চাষাবাদকে কেবলমাত্র জীবন ধারণের উপায় করে রেখে দিলে চলবে না। এখানেও চাই বিনিয়োগ। শিল্প উন্নয়ন কৃষিতে উন্নতি আনবে। আর এর সব কিছুর মূলে থাকবে শিক্ষা। তত্ত্বের কচকচি নয়, হাতে কলমে শিক্ষার কারবারি ছিলেন ম্যালকম। তাই এই মাষ্টার মশাই ক্লাসঘরের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে ছাত্রদের নিয়ে গ্রামের ক্ষেত-খামারে ঘুরে ঘুরে অর্থনীতির তত্ত্বগুলো ঝালিয়ে নিতেন। হাতে পেষাই করা চাল আর হাতে বানানো কাগজ, তাঁত ফসল ফলনের আর গ্রামীণ ধার বাকির পিছনে যে অর্থনীতি কাজ করে তার মাপজোক করতেন। আর জোর গলায় প্রতিষ্ঠা করতেন এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের ভূমিকার কথা, যেখানে শিক্ষা এসে হাল ধরবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পনেরো বছরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ষাটটি দেশ উপনিবেশের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। আর প্রায় এই সময় ধরে– ১৯৫০-৬০, আদিসেশিইয়া জাতিপুঞ্জের সামাজিক– অর্থনীতি বিভাগ ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকেন। কাজের সূত্রে তাঁকে প্রায়ই যেতে হত সেই সব সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলিতে। এই দেশগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতার পটভূমিকায় ছেয়ে ছিল গভীর দারিদ্র, সামাজিক-অর্থনৈতিক অসাম্যতা, শিল্পায়নে অনভিজ্ঞতা। তার সাথে ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, যা আদতে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের ভালো থাকার সাথে সম্পর্কিত ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসকের চাহিদা চরিতার্থ করাই ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। আদিসেশিইয়া মতে শিক্ষার উপর নির্ভর করে সমাজ পরিবর্তন আর প্রযুক্তি গত প্রগতি। সমাজের চলমান সামাজিক অর্থনৈতিক চাহিদার

সঙ্গে ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষার মিলন সাধন করবে শিক্ষা। চাকরির বাজারের বাজারের প্রতিযোগী তৈরি করার সাথে শিক্ষা আবার ধরে রাখবে, বয়ে নিয়ে চলবে দেশজ সংস্কৃতি এবং তার ঐতিহ্য। প্রতিফলিত করবে সমাজের মূল্যবোধ ও নিয়মকানুন। তাঁর মতে শিক্ষা হল এক ধরণের উদ্যোগ যার লক্ষ্য আছে, আছে উদ্দেশ্য। কী পড়ানো-শেখনো হবে তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করার সময় সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক-রাজনৈতিক চাহিদা বুঝে নিতে হবে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার নিজস্ব চাহিদা – অবস্থান অনুসারে শিক্ষাকে হতে হবে বাস্তবমুখি ও সুসঙ্গগত। ইউনেস্কোর প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিভাগের নির্দেশক হিসাবে আদিসেশিইয়াকে ঘুরে বেড়াতে হত নানা দেশে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের দৌড় তার নজরে আসত। আর এখানেই তিনি তাঁর বিশ্বাস কাজে লাগাতেন। যেহেতু শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে তাই তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোর শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, সেই সব নেতা, মন্ত্রীদের সাথে গিয়ে কথা বলতেন। প্রথমেই তিনি এই সব দেশের নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে, উন্নয়নকে ঘিরে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে উপলব্ধি সঞ্চারিত করতেন। এর পরের কাজ দেশগুলিকে তাদের নিজ নিজ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে সাহায্য করতেন। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে মাথায় রেখে স্থির করা হত। এর পরের ধাপে রাষ্ট্রগুলিকে যথাযথ শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হত, যাতে স্বল্প খরচে সর্বোচ্চ লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়। জাতীয় পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত কাজ হল শিক্ষা সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি নির্ধারণ করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা অবস্থান নির্দিষ্ট করে ফেলা। ১৯৬০ এর দশক জুড়ে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত খুলে যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের শিক্ষা পরিকল্পনায় আদিসেশিইয়ার অর্থনৈতিক পরামর্শ প্রামাণ্য মনে করত। তাঁর উৎসাহে উন্নয়নশীল দেশগুলি জাতীয় পরিকল্পনার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আঞ্চলিক স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনার ছক তৈরি করার সাহস পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে করাচীতে প্রথম এশিয়া মহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরি হয়। এবং তার পরে পরেই এই অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আফ্রিকায়, আরব দেশে, লাতিন আমেরিকায়। ধীরে ধীরে ইউনেস্কোর প্রযুক্তিগত সহায়তা বিভাগটি জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্পে (ইউ এন ডি পি) তে পরিণত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য পরিকল্পনা মাফিক সহায়তা আরো সংগঠিত হয়ে ওঠে। আদিসেশিইয়ার উৎসাহে এই বিভাগের সিংহভাগ অর্থ শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ হতে শুরু করে।

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের ওতঃপ্রোত সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে আদিসেশিইয়াকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হত। করতে হয়েছে প্রচুর লেখালেখি। ইউনেস্কোর অফিস ঘরের

টেবিলে বসে চলত তাঁর গবেষণা। ইউনেস্কোর বর্ষপঞ্জী ঘেঁটে ঘেঁটে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মাথা পিছু বৃদ্ধি হারের সঙ্গে স্কুল-ভর্তি আর শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা তৈরি করতেন। অন্যদের লেখা গবেষণা পত্রগুলো পড়ে বের করে আনতেন তাদের সারমর্ম। শিক্ষার ফলে, স্কুল-কলেজে বিনিয়োগের ফলে, বয়স্ক শিক্ষা – সাক্ষরতা আর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে ফলে ব্যক্তির উতপাদনশীলতা বাড়ে, কারবারের লাভ বৃদ্ধি পায়। প্রথাগত ও প্রথাবিহীন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সঙ্গে সুস্থায়ী উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্কের পক্ষে প্রমাণ জোগাড়ে ব্যস্ত থাকতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর দাবির স্বপক্ষে আওয়াজ তুলতেন। আর তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় ২০ বছর পর ১৯৬২ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আদিসেশিইয়া জোরের সাথে ঘোষণা করতেন উন্নয়নের মানবিক দিকটা উপেক্ষা করলে সেই উন্নয়ন কোনদিনও সুস্থায়ী হবে না। আর সুস্থায়ী উন্নয়নের পরিকাঠামো নির্ভর করে শিক্ষার উপর। শিক্ষা কেবল ব্যক্তির বৃত্তিমূলক প্রস্তুতির পণ্য নয় জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হল শিক্ষা। শিক্ষা হল দেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুঁজির লগ্নি। দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে নানান মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে নানান জটিলতা আর অসাম্য দেখে শিক্ষার মনমোহিনী জাদুর কথাই মনে করেছেন আদিসেশিইয়া। অশিক্ষিতের সামনে শিক্ষা পারবে অভিজ্ঞতার দুনিয়া খুলে দিতে। তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন। দারিদ্রতাকে অমোঘ ভাগ্য বলে আর মেনে নেবেন না। তাঁরা সচেষ্ট হবেন পরিস্থিতিকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে। নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নতুন নতুন দক্ষতায় শিক্ষিত হবেন, নিজেদের স্বাস্থ্য পরিবারের স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন, নিজেদের জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় বদল আনবেন, যাতে তাঁরা প্রগতিশীল দেশের সক্ষম নাগরিক হয়ে উঠতে পারেন। আদিসেশিইয়ার শিক্ষাচিন্তা, তাই আশ্বাসের কথা বলে, আত্মবিশ্বাসের কথা বলে। ভারতের গ্রামগঞ্জগুলি মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ। তাঁদের মন প্রাণ সহজাত জ্ঞানে ভরপুর। তাঁদের এই বিপুল উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত পড়ে আছে। তার কারণ ভয়ঙ্কর নিরক্ষতা কৃষি পণ্য উতপাদনে বিস্তার আনতে প্রয়োজন স্বাস্থ্য আর শিক্ষায় উন্নতি। গ্রামের মানুষের আর দেশের কৃষকশ্রেণীর জীবিকার উন্নয়নে প্রয়োজন বয়স্ক শিক্ষার প্রসার।

প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তৃতীয় বিশ্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নে লক্ষ্যে আদিসেশিইয়া অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন। জীবনের ২৫ বছর প্রকৃত অর্থে বিশ্ব নাগরিক হিসাবে কাটালেও জীবনের শেষ দিনগুলো গ্রামীণ ভারতের সমস্যা সমাধানেই কেটেছে। তাঁর তৈরি করা মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলাপমেন্ট স্টাডিজে আর্থ সামাজিক নানা বিষয়ে গবেষণা শুরু হয় তাঁরই নেতৃত্বে। জীবনান্তে তাঁর সব দিয়ে যান এই সংস্থাকে।

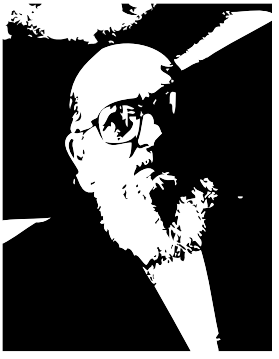

(১৯২১-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ)

পাওলো ফ্রেইরী

হেনজ্ পিটার গেরহার্ড রচিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

নীরবতার বাতাবরণ ভেঙে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে মানুষ। এমন মানুষ যারা তুচ্ছ, নগণ্য, অধিকারহীন, নিপীড়িত। শব্দকে হাতিয়ার করে উঠে দাঁড়াচ্ছে তারা। যে পরিস্থিতি, পরিবেশ তাদের গলাটিপে রেখেছে, সেটাকে বদলাবার চেষ্টা করছে তারা...

পাওলো ফ্রেইরীর জীবন নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ হলে, শেষ দৃশ্যটা এমনটা হলে তবেই মানাবে।

পাওলো ফ্রেইরী জন্মেছিলেন ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ সালে। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রেসিফে (Recife) শহরে। সেই সময় ব্রাজিলসহ সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে চলছিল অর্থনৈতিক মন্দা। আর রেসিফে শহরটি কুখ্যাত ছিল তার দারিদ্র্য আর অভাবের জন্য। পাওলোর ছোটবেলা কাটে গরিবগুর্বো দূর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সংস্পর্শে। আর্থিক অনটনের কারণে পাওলোর স্কুলজীবন বারবার ব্যাহত হয়। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের আইনজীবি হিসাবে। শ্রমিকদের নানা বিষয়ে আইনি পরামর্শ দিতেন পাওলো ফ্রেইরী।

সেই সূত্র ধরে ফ্রেইরী কারখানার শ্রমিক মজুরদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি নিরক্ষর খেটে খাওয়া মানুষগুলোর শিক্ষণের কাজে লেগে পড়েন। পাওলো নিজেও ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর্থিক দুরাবস্থা তাঁর পরিবারকে তাড়িয়ে ফিরেছিল। চারপাশের অনাহার আর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষদের দেখতে দেখতে তিনি এদের মধ্যে এক "নীরবতার সংস্কৃতি" লক্ষ্য করেছিলেন। আর্থিক অনুশাসন, সামাজিক ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের চাপে মানুষগুলো মূঢ়, জড়বৎ জীবনযাপন করত। ক্ষমতাবানেরা শিক্ষাকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং এই অবদমন আর নীরবে মেনে নেওয়ার সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখে। পাওলো ফ্রেইরী ব্রাজিলের নিপীড়িত সমাজের সামনে তুলে ধরেন প্রশ্নমুখী শিক্ষা। পড়ুয়ারা সেখানে নীরব নিষ্ক্রিয় নয়। তারা তাদের চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে শেখে, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে করতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে শেখে। পড়ুয়ারা নিষ্ক্রিয় থেকে বস্তু বা অবজেক্ট থেকে সক্রিয় সাবজেক্ট বা বিষয়ী হয়ে উঠতে থাকে। পড়া-শেখা-জানার পরিমণ্ডলে ঘটে যায় এক উত্তরণ। আর ব্যক্তি উত্তরণের ছাপ গিয়ে পড়ে সমাজ-পরিবেশে। সেখানে ঘটতে থাকা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ

মানুষের রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তৈরি হয়। পাওলো মনে করতেন যে মানুষ নিজেই নিজের সমস্যা থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে নিতে পারবে। এই ভাবেই পাওলো ফ্রেইরী শিক্ষাকে সমাজ উত্তরণের হাতিয়ার হিসাবে দেখতে চেয়েছেন এবং সারাজীবন সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে গেছেন তিনি।

পাওলো ফ্রেইরীর বাল্যজীবনের দিকে যদি আমরা ফিরে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সমুদ্রতীরের বালুতটে ছোট্ট পাওলো তার চেনা জানা শব্দ বলে চলেছে আর তার বাবা বালির উপর কাঠি দিয়ে সেই শব্দগুলো লিখে চলেছে। একেকটা শব্দ লিখছেন আর শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট শব্দ ধ্বনিতে ভাঙছেন। টুকরো টুকরো নানান শব্দ-ধ্বনি জুড়ে জুড়ে পাওলো আর তাঁর বাবা তৈরি করে চলেছেন আরো আরো নতুন নতুন শব্দ। পরে বড় হয়ে নিরক্ষর মানুষের সঙ্গে সাক্ষরতার কাজ করতে গিয়ে পাওলো কি ওই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন ? তার কারণ ফ্রেইরীর প্রবর্তিত বয়স্ক শিক্ষা এগিয়ে ছিল এই প্রক্রিয়ায়ঃ প্রথমে পড়ুয়ারা তাদের চেনা – জানা, পরিচিত জগৎ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শব্দের জোগান দেবে। শব্দগুলো হতে হবে পড়ুয়ার অত্যন্ত পরিচিত এবং নিত্য-ব্যবহৃত। যেমন ধরা যাক সেই শব্দগুলি হলঃ বস্তি, লোক, ভোট, রুটি ইত্যাদি।

এগুলোকে বলা হয় মৌল শব্দ। এক একটা শব্দের সঙ্গে দেওয়া হবে শব্দ মিলিয়ে এক একটা ছবি। এই ছবি ঘিরে শুরু হবে সংলাপ–আলোচনা। আর সেই আলোচনায় উঠে আসবে নানা প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও প্রশ্ন। আলোচনায় প্রতিফলিত হবে পড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনধারা। শব্দ পড়তে পারার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ারা তাদের বাস্তব জীবন নিয়ে পড়বে, কথা বলবে, মতামত দেবে। নিজেদের জীবনকে নিজেদের মত করে তারা বুঝতে পারবে। পাওলো ফ্রেইরীর এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ শুধু সাক্ষরতা অর্জন করবে তাই নয়, সেই সঙ্গে পড়ুয়াদের মধ্যে গড়ে উঠবে নতুন চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ, বিচার-বিবেচনা ও মূল্যবোধ। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নিজেদের অক্ষমতার বেড়া-জাল ভেঙ্গে নিজেদের নিয়তির নিয়ন্তা হয়ে উঠবে নিজেরাই। এমনটাই ঘটেছিল ব্রাজিলে। ফ্রেইরীর সাক্ষরতা প্রকল্প অভিভূত রূপে সফল হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দেশের চারকোটি নিরক্ষর মানুষ যাতে সাক্ষর হয়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে তদানীন্তন ব্রাজিল সরকার প্রচেষ্টা করেন। সেটা ছিল ১৯৬৩ সাল।

১৯৬৪ তে ব্রাজিলের মিলিটারি শক্তি সে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে হটিয়ে দেয়। দেশ জুড়ে যে জনপ্রিয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায়। মিলিটারি শাসনতন্ত্র পাওলো ফ্রেয়ারের শিক্ষা দর্শনকে "ধ্বংসাত্মক" সাব্যস্ত করে এবং পাউলোকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

পাউলো ফ্রেইরী চলে যান বলিভিয়া। সে দেশের শিক্ষামন্ত্রকে কাজ নেন তিনি। বলিভিয়াতেও ঘটে যায় রাজনৈতিক পালাবদল। বলিভিয়া ছেড়ে পাওলো চলে যান

চিলি-তে। সেখানে তিনি কৃষকদের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে নিজেকে নিযুক্ত করেন।

পাউলো-র শিক্ষাদর্শ পড়ুয়াদের মধ্যে প্রশ্ন করতে শেখায়। কৃষিকাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের মজুরি কাঠামোতে কোন উন্নতি ঘটে না। ফ্রেইরীর শিক্ষা প্রকল্প এই দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে এবং তা নিয়ে নানা বিতর্ক ও আন্দোলনকে উৎসাহিত করে। গ্রামীণ কৃষি নির্ভর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রযুক্তিগত সহায়তার নামে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবদমনও প্রকট হয়ে উঠছিল। ঠিক সেই সময়ে ফ্রেইরীর মুক্তিকামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটতে শুরু করে। তিনি তাঁর শিক্ষার কথা বলতে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান – যান আমেরিকা আর আফ্রিকার দেশগুলোতেও। ফ্রেয়ারে নিজেই বলতেন যে তাঁর শিক্ষাচর্চা দলিত– নিপীড়িতদের প্রতি অনেক বেশি দায়বদ্ধ।

জেনেভায় ফ্রেইরী এবং আরো কয়েকজন নির্বাসিত ব্রাজিলিয় মানুষ একজোট হয়ে তৈরি করেন ইনস্টিটিউট ফর কালচার্যাতল অ্যাকশন। এই সংস্থার কাজ ছিল তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীনকামী দেশগুলোকে মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিষেবা দেওয়া। এই পরিষেবার উদ্দেশ্য ছিল দেশগুলির শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই চেতনার জাগরণকে পাওলো ফ্রেয়ারে বলতেন বিবেক-উন্মেষ বা কনসেন্টাইজেশন। পাওলো ফ্রেইরী বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায় বোধ তৈরি হলেই মানুষ সকল বাধা-বিপত্তি ও অধীনতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে নেবে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ভাবনায় পাওলো ফ্রেইরীর শিক্ষাদর্শের লক্ষণ দেখতে পাই যখন ২০০৫ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় "ঊর্বর ও প্রাণময় শিক্ষা নির্মাণের" কথা বলা হয়। আর এই নির্মাণের শিকড় যে পড়ুয়ার "ভৌত ও সাংস্কৃতিক মাটিতেই গাঁথা থাকে"– সে কথাও এই রূপরেখা বলে। আমরা আশায় বুক বাঁধি।

(১৯২২-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ)

জুলিয়াস কামবারাগে ন্যেরেরে

ইউসুফ কাসসাম- এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

একটি সেমিনার চলছে। আলোচনার বিষয়ঃ শিক্ষা আর উন্নয়ন। চলছে মত প্রকাশ, আদান প্রদান, আলোচনা। সেমিনারের ঘরটা যদি বড়ো হতে হতে গোটা একটা দেশ হয়ে যায়। আর সঞ্চালক –অধ্যক্ষের চেয়ারে যদি বসেন সে দেশের রাষ্ট্রপতি!

১৯৫৭ সাল। তানজানিয়া প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস ন্যেরেরে। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশটা সরগরম – ঔপেনিবেশিক ধারায় বাঁচা বস্তা-পচা সমাজটাকে পাল্টাতে হবে।রাষ্ট্রপতি তাঁর দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করছেন। ঘোষিত হচ্ছে " আরুশা ডিক্ল্যারেশন"। এ দেশে উন্নয়নের ভিত্তি হবে সমাজবাদ আর স্বনির্ভরতা। কোন পথে উন্নয়ন হবে ভাবতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর শিক্ষা দর্শন প্রকাশ করছেন। উন্নয়নের লক্ষ্য মুক্তি। শিক্ষার লক্ষ্যও মুক্তি। রাষ্ট্রপতির অন্তরে লুকিয়ে থাকে এক শিক্ষক। জুলিয়াস ন্যেরেরে- র পথ চলা শুরু হয় ক্লাস ঘর থেকেই।

তাই রাষ্ট্রনেতার ভূমিকা পালনের পিছনে শিক্ষার দুনিয়া থেকে শিখে নেওয়া এক প্রত্যয়। যার বৈশিষ্ট্যঃ অবিরাম মূল্যায়ন, অবিরাম শিখন আর ব্যাখ্যা। দেশ গঠন হয়ে দাঁড়ালো বৃহৎ অর্থের শিক্ষা চর্চা।

তানজানিয়ার সামনে তখন অনেকগুলো লড়াইঃ-

১) দারিদ্র
২) সামাজিক–অর্থনৈতিক অসাম্য
৩) জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ৪) আর সবচেয়ে পীড়া-দায়ক ঔপেনিবাশিক শাসনে ন্যুব্জ এক জাতি। নৈরাশ্য আর অদৃষ্টের দোরগোড়ায় মাথা খুঁড়ছে।

ন্যেরেরে দেশের হাল ধরলেন। তানজানিয়া হয়ে উঠবে স্বনির্ভর। উন্নয়নের উড়ান চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য কায়দার উন্নয়ন নয়। ধন, অর্থের হাত ধরে উন্নয়ন আসবে না। আসবে মানুষের হাত ধরে। সমাজবাদী উন্নয়ন, মানুষ কেন্দ্রিক উন্নয়ন। উন্নয়নের ফলে থাকবে সবার সমান অধিকার। ন্যেরেরে -এর মতে এই উন্নয়নকে পূরণ করতে হবে তিনটি পূর্ব শর্তঃ জমির সদ্ব্যবহার, সু-নীতি, সু-নেতৃত্ব। কৃষি প্রধান দেশ তানজানিয়া। উন্নয়নের বাস্তব রূপায়ণ হতে হবে গ্রামে। গ্রামের মানুষ এক সঙ্গে বাস করবে, কাজ করবে। সমবায় ভিত্তিতে তৈরি হবে সংগঠিত গ্রাম বা "উজামা" (বাংলায় "পরিবারত্ব)। পরিবারত্ব হবে তানজানিয়ান সমাজবাদের ভিত্তি। এই সমাজবাদী,

স্বনির্ভর উন্নয়নে সক্রিয় অংশ নেবে সাধারণ মানুষ। উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনায় অংশ নেবে মানুষ। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে কোন পথ ভালো বা মন্দ। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তারা যোগদান করবে। প্রত্যেকের জীবনমান উন্নীত হবে। দেশে রাজনৈতিক- সামাজিক সমতা প্রসারিত হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য বিলাসবহুল জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা উন্নয়নের লক্ষ্য হবে না। সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করতে করতে ন্যেরেরে এক বিকল্প শিক্ষা মডেল পেশ করলেন। ঔপেনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার খোল-নলচে বদলাতে হবে। দেশ গঠন চলবে দুই ডানায় ভর করেঃ–

১) স্বনির্ভরতার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা

২) বয়স্ক শিক্ষাক্রম যার লক্ষ্য হলো জীবনভর শেখা- জানা আর যুক্তিকামিতা।

ন্যেরেরে –র বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা হবে সমতা, স্বনির্ভরতার দূত। ঔপেনিবেশিক কৌলিন্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে। তেমনটি চাইলেন ন্যেরেরে। বিশেষ কয়েকটি পেশায় মানুষ যোগান দেওয়ার কাজ শিক্ষার নয়। শিক্ষিত হয়ে ওঠার অর্থ সমাজ বিচ্ছিন্নতা নয়।

ন্যেরেরে–র প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথ মনে রাখতে হবেঃ –

১) কৃষি প্রধান তানজানিয়ায় শিক্ষাকে হতে হবে গ্রামমুখী।

২) শিক্ষক/ শিক্ষিকা– পড়ুয়ারা স্কুলের মধ্যেই উৎপাদনশীল কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত থাবেন। আর এই ধরনের কর্মসূচী পরিকল্পনা করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পড়ুয়ারাও অংশ নেবে।

৩) স্কুল পাঠক্রমে এই উৎপাদনমুখী কর্মসূচী অর্ন্তভুক্ত থাকবে। তত্ত্ব আর চর্চার মেলবন্ধন ঘটবে। শেখা-জানা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

৪) চলতি প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষা পদ্ধতি গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। পরীক্ষায় পাস করার মূল্য থাকবে না। পড়ুয়ার পড়াশোনার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব পাবে সে সমাজ-গোষ্ঠীতে কতটা অবদান রাখছে।

৫) শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার শুরু হবে ৭ বছর বয়সে। সে যখন প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি পেরোবে, ততদিনে সে একজন স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠেছে।

৬) শিক্ষার প্রতিটি স্তর– প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা– নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের উপায় হয়ে থাকবে না। তেমনি মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষা লাভের উপায় মাত্র নয়।

৭) পড়ুয়ারা হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী, সহযোগী। তাদের মন হবে সক্রিয়, অনুসন্ধিৎসু। সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি হবে এই স্কুলেই।

ন্যেরেরে গভীর ভাবে বিশ্বাস রাখেন উন্নয়ন রূপায়ণে বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকার কথা। জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনাকে উসকে দেওয়ার কাজ করে বয়স্ক শিক্ষা। ন্যেরেরে– এর মতে বয়স্ক শিক্ষার বিষয়টি অনেকটাই রাজনৈতিক। এই শিক্ষার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি নিজের পরিস্থিতিকে বিচার – বিশ্লেষণ করতে শেখে, তার মনে প্রশ্ন জাগে। অনুসন্ধান করতে করতে পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথ, উত্তরণের পথ খুঁজে পায়। নিজস্ব ব্যক্তিগত উত্তরণের সাথে সাথে সমাজের উত্তরণের উপায় খুঁজে পায়। বয়স্ক শিক্ষাক্রমের পড়ুয়ারা নিজেরাই স্থির করবে তারা কী শিখবে। শিক্ষকের কাজ হবে শেখার পথে সঙ্গী হয়ে পথ দেখানো। শিক্ষা নিয়ে জুলিয়াস ন্যেরেরে-র অপূর্ব একটি উক্তিঃ "বেঁচে থাকাটাই শেখা। আর শেখা মানেই আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকা"।

তানজানিয়ার উন্নয়ন সমাজবাদের পথ ছেড়ে ধনতান্ত্রিক পথ ধরেছে বহুদিন ন্যেরেরে-র শিক্ষা নিয়ে। স্বপ্ন গুলো কতক পূরণ হয়েছে, কতক হয়নি। যেটা হয়েছে, সেটা হলো তানজানিয়া জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। যার ফলে স্বাস্থ্য, কৃষি সংক্রান্ত খবরাখবর দেশের কোনায় কোনায় সহজেই পৌঁছে যায়। আর বয়স্ক শিক্ষায় তানজানিয়ার উদ্ভাবনী উন্নয়ন "বিপ্লবের" আখ্যা পেয়েছে।

(১৯২৬ - ২০০২ খ্রিস্টাব্দ)

ইভান ইলিচ

মার্সেলো গাজারদো- এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

এক যে ছিল রাজার দেশ
সব রকমের ভালো
রাতে সেথায় বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।

এমন উল্টো অবস্থা যদিও বা হয়। কিন্তু এমনটা কি হওয়া সম্ভব– পড়াশোনা–শেখা–জানা চলছে কিন্তু স্কুল নেই, বিদ্যালয় নেই, ক্লাসরুম নেই। আর এমনটা হতে বাধা কোথায় ? যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শেখা জানার সুযোগ রয়ে যায়। কেউ না কেউ শেখায় আর আমরা শিখি। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানত তিনটি লক্ষ্য থাকবেঃ-

১) যারা শিখতে চায়, জানতে চায় তাদের সামনে শেখা– জানার সবরকমের রসদ জোগান রাখা। পড়ুয়ারা যে কোন সময় এই শেখা– জানার প্রক্রিয়ার প্রবেশ করতে পারবে।

২) এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যে যিনি কোন বিষয় জানেন বোঝেন এবং তিনি যদি তার জ্ঞান ভাগ করে

৩) নিতে চান এবং যাঁরা এই জ্ঞান গ্রহণ করতে চান, শিখতে চান, জানতে চান – এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।

৪) কোন বিষয়ে কেউ যদি তাঁর মতামত দিতে চান, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে চান তবে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে তার মতামত জানানো সুযোগ থাকবে।

এছাড়াও যথোপযুক্ত শেখা-জানার প্রক্রিয়া সম্ভব করে তোলার জন্য থাকবে নানা ধরনের পরিষেবা। যেমন ধরুন বইপত্র ও নানা ধরনের শিক্ষণ সামগ্রী পাওয়া যাবে লাইব্রেরী, পরীক্ষাগার ও প্রদর্শনশালাগুলিতে। এখানে এসে পড়ুয়ারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পড়াশোনার রসদ জোগাড় করে নিতে পারবে।

আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে নানান প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নানান প্রয়োজনে আসা– যাওয়া করে। যেমন ধরুন কারখানা, রেলষ্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অবস্থান করে নানান বিনোদন কেন্দ্র যেমন নাট্যশালা (থিয়েটার), জাদুঘর, সিনেমা। আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে বসেছি সেখানে এই বিনোদনকেন্দ্রগুলো স্কুলের বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

জাদুঘর, থিয়েটারের মতো বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে রাখা থাকবে কারখানা,

বিমানবন্দর, রেলষ্টেশন বা আরো অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমন সব নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। আর জাদুঘর বা থিয়েটার দেখতে এসে হবু পড়ুয়ারা কিছুটা সময় সহরা কিছুটা সময় শিক্ষানবিস হিসাবে এখানকার উপকরণ ব্যবহার করে কাজ শিখে যেতে পারবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে নানা ধরনের নেটওয়ার্ক। দক্ষতা আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক– যার সাহায্যে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ তার জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারবেন জানতে ও শিখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে।

এছাড়াও এমন সব নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে নানান শিক্ষণীয় কাজের বিবরণী দেওয়া থাকবে জিজ্ঞাসু সতীর্থরা এই নেটওয়ার্কের সাহায্য নিয়ে তাদের অজানা বিষয়গুলি জেনে নিতে পারবে।

এহেন মুক্ত, জীবনভোর শেখা– পড়ার ব্যবস্থা কথা ভেবে ছিলেন ইভান ইলিচ। ১৯২৬ সালে ভিয়েনায় জন্মে ছিলেন। পড়াশোনা করেছিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুলে। কর্মজীবনে প্রথম দিকে ধর্মযাজক ছিলেন। পুয়ের্তো রিকোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন। এখানে থাকাকালীন নানা দেশের নানা সংস্কৃতির মানুষের সংস্পর্শে আসেন। বিচিত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ভাবনা জাগে তাঁর মনে। তৈরি করেন আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ কেন্দ্র। ভাষা শিক্ষার সাহায্যে নিজের সংস্কৃতির চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিকে জানা বোঝা দেখার চোখ তৈরি করাই ছিল এই কেন্দ্রের কাজ। পরে নিজের সংস্কৃতির চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিকে জানা বোঝা দেখার চোখ তৈরি করাই ছিল এই কেন্দ্রে কাজ। পুয়ের্তো রিকো ছেড়ে চলে আসেন লাতিন আমেরিকার মেক্সিকোতে। ১৯৬১ সালে এখানেও তৈরি করেন আরও একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগ কেন্দ্র। আর এই কেন্দ্রে বসেই তিনি ভাবতে শুরু করেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা যা স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে সর্বতো ভাবে কেন্দ্রিভূত হবে না। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার অ-সারতা নিয়ে ইলিচের নেতৃত্বে নানান তর্ক – বিতর্ক শুরু হয়। আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল তার জেহাদ যার ঢেউ গিয়ে পড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আর স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি সবচেয়ে বেশি ধারালো ছিল। স্কুল ছিল ইলিচের কাছে "সোনার পাথর বাটি"। কীভাবে স্কুল ব্যবস্থার বেড়াজাল টপকে শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর ভাবনা। ইলিচ মনে করতেন জীবনধারণের প্রতিটি মুহূর্তে শেখা– জানার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য করে তুলেছে আজকের সমাজ। শিক্ষাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে স্কুল প্রথা। ইভান ইলিচের মতে স্কুল ব্যবস্থা আর শিক্ষা– এদুটির অবস্থান একে অন্যের বিপরীতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন ইলিচ। শিক্ষাকে পণ্য করে বাজারে ছাড়ছে স্কুল। ধনতান্ত্রিক সমাজে স্কুল উৎপাদিত শিক্ষা এক নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য থাকে। আর এই সমাজে যাদের মুঠোয় মূলধন আছে তারা এই শিক্ষা–

নামক পণ্যটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার আদায় করতে পারে।

ফলে সর্বজনের জন্য উত্তম মানের শিক্ষা পরিষেবা স্কুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে স্কুলের ব্যবস্থার সাহায্যে সবার জন্য সমমানের উত্তম শিক্ষাপ্রদান অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের জন্য চাই বিকল্প প্রতিষ্ঠান। স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি ধারনা যা আমরা বিশ্বজনীন সত্য বলে মনে করি ইলিচ সেই ভাবনার অচলায়তনে আঘাত করেছেন কড়া ভাষায়। সত্যগুলো যে আসলে অলীক অবাস্তব তাই তিনি বলতে চেয়েছেন। যেমনঃ-

আমরা বিশ্বাস করি যে স্কুল মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। এই বিশ্বাসের ফলে তৈরি হয় স্কুলের চাহিদা। স্কুলের অস্তিত্ব স্কুলের চাহিদা বাড়ায়। স্কুল ব্যবস্থা আমাদের বোঝায় যে স্কুলে যাওয়ার সঙ্গেই মূল্যবোধ শেখা জানা জড়িয়ে আছে। স্কুল হাজিরার সঙ্গে শেখা– পড়া যেন সমানুপাতিক। বেশি বেশি করে স্কুলে গেলে শেখার মূল্য বাড়ে। এই শেখার মূল্য আবার পরিমাপ করা যায় নম্বর, গ্রেড, সার্টিফিকেটের সাহায্যে। ইলিচ এই ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা এমন এক মানবিক প্রক্রিয়া যাতে অন্যের হস্তক্ষেপ সবচাইতে কম লাগে। নিজের জীবনের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে বাইরের কারুর নির্দেশ ছাড়াই পড়ুয়ারা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি শিখে নিতে পারে। শেখার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটে যখন পড়ুয়ারা এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। ইলিচ মনে করতেন যে একজন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব উন্নতি বা বেড়ে ওঠা কখনই স্কুল নির্ধারিত মাপকাঠির সাহায্যে বিচার করা যায় না। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের বোঝানো হয়েছে যে স্কুলের তৈরি মূল্যবোধ মাপা যায়।

ইলিচের মতে স্কুল পাঠক্রম বিক্রি করে। আর পাঁচটা বিপণন কেন্দ্রের মতো স্কুলের হাতে পড়ে শিক্ষা পণ্য হয় ওঠে। শিক্ষক যেন পণ্যবণ্টনকারী আর ছাত্র-ছাত্রীরা হলো উপভোক্তা। উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যে ভাবে পণ্যের গুণমানে ঘষা-মাজা করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ের পাঠক্রম এই ভাবে তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ভোগ করার সাথে সাথে তার উৎপাদন ও বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এর জন্য তৈরি হয় ভুরি ভুরি ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট। আর এগুলোকে করায়ত্ত করতে চলে ইঁদুর দৌঁড়। পড়ুয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের ইঁদুর দৌঁড়। যত ডিগ্রি তত যেন ভালো রোজগারের সুযোগ। পণ্য সর্বস্ব সমাজে এই ধারনায় চলে। বাজারে পণ্যের চাহিদা অনুসারে উপভোক্তারা যেমন নিজেদের ক্রেতা মানসিকতা তৈরি করতে সমাজের অন্যান্য অংশ যেমন– পরিবার, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, গণমাধ্যম প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে স্কুলের ভূমিকা সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রসারি। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার জয় জয়কারের মূলে আঘাত করেছেন ইলিচ। স্কুল শিক্ষার বাধ্যতামূলক অবস্থানকে আঘাত করেছেন তিনি। জ্ঞান আহরণ বা যে কোন শেখা যে একটা প্রক্রিয়া

বার বার তিনি আমাদের মনে করাতে চেয়েছেন। আর এই শেখা-জানার প্রক্রিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের আটকে থাকতে পারে না। সত্তরের দশকে ইলিচের ভাবনা শিক্ষাজগতে ঝড় তুলেছিল। তাঁর ভাবনার রেশ ধরে আজ আমরা সেই সব স্কুল দেখতে পাচ্ছি যারা পরিবেশ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দেয়। এবং যারা সামাজিক ভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর ভাবনা মৌলিকতা এতোটাই যে সেগুলোকে বাস্তবায়িত না করা গেলেও তাঁর ভাবনার অকাট্যতা আজ টের পাওয়া যাচ্ছে। ইলিচের স্কুল-হীন সমাজ ভাবনার প্রসার ঘটেছে আজকের শিক্ষাবিদদের মনে। তাঁর ভাবধারার সাহায্য নিয়ে এমন সব নীতি ও প্রকল্প তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে প্রথাগত ও প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার মধ্যেকার সঙ্কট দূর করা সম্ভব হচ্ছে। আজকের দিনে প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের জন্য যে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাক্রম তার প্রস্তাবনায় আমরা ইলিচের ভাবনা দেখতে পাই। নানা ক্ষেত্রে যে জীবনভর শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়েছে, তাতেও পাই ইলিচের ছোঁয়া। আজ দেশে দেশে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে, তৈরি হচ্ছে গবেষণা ও তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক। এগুলোর সবই ইলিচের ভাবনায় ছিল। একমাত্র ইলিচের ভাবনাকে উপেক্ষা করে বাজার এখন রমরমিয়ে চলছে।

একে বদলাতে গেলে চাই ভীষণ এক বদল– যা ঘটতে হবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে। অর্থনীতি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জীবন ধারণের মাত্রা, কাজের পরিবেশ, শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে। এই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র, বে-রোজগারি। আর এই ভীষণ বদলের লক্ষ্য হবে এক সমন্বয়পূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করবে সৃজনশীলতা, মুক্তি ও উদ্দীপনার উপর আর যে প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ অংশ নেবে উৎসাহের সঙ্গে।

AHEAD Initiatives